স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৬ষ্ঠ বর্ষ ❑ চতুর্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল-মে ২০১৭

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে ,
গোপাল সরকার,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু
বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
***স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র** তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া,
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

স্টেন্টবাজি ও অন্যান্য ভোজবাজি
এনপিপিএ স্টেন্ট-এর দাম এক ধাক্কায় অনেকটা কমিয়ে দিতেই কর্পোরেট হাসপাতালগুলোর রোগী ঠকিয়ে বিপুল অনৈতিক মুনাফার বহর বেআবরু হয়ে পড়ল। মুখ্যমন্ত্রীও টিভির সামনে কর্পোরেট হাসপাতাল-কর্তাদের খুব বকেছেন। সরকারি হাসপাতালে নাকি বিনি পয়সায় চিকিচ্ছে মেলে! তবে কর্পোরেট 'বেওসাদারদের' দোরে মাথা ঠোকে কেন মানুষজনে! কেন্দ্রীয় সরকারের এক কমিটি জানিয়েছিল—সরকারই 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' সম্ভব করে তুলতে পারে। এখন আর কেউ তা নিয়ে রা-টি কাড়ে না; কাজে করা তো দূরের কথা—লিখেছেন প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়। ৫

গলাজ্বলা ও GERD
গ্যাস-অম্বল যেন বাঙালির নিত্য-সহচর, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে অ্যান্টাসিড আর নানা কিসিমের ওষুধ। লালমুখো সাহেবদের দেশেও এইসব ওষুধ বিক্রির দিয়ে ওপরে। কেন হয় গ্যাস-অম্বল-গলাজ্বালা-বুকজ্বালা? ওষুধ ছাড়া কি উপায় নেই কিছু? লিখেছেন ডা. অপূর্ব। ১০

জন্মনিয়ন্ত্রণ: নারী ও সম্প্রদায়
আমাদের দেশে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি কি একটা বড়ো সমস্যা? কাদের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে? কারাই বা কমছে সংখ্যায়? সারা বিশ্বে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ধারা কোন খাতে বইছে? মেয়েরা কি জন্মনিয়ন্ত্রণের সুফল পাচ্ছেন, নাকি কেবল দায়টুকু তাঁদের ঘাড়ে? মেয়েদের সংখ্যা কমছে কেন, কাদের মধ্যে? উত্তরগুলো অজানা নয়, কিন্তু সরকারি বা নানা দলের প্রচারের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক সামান্যই—লিখেছেন ডা. সুমিতা দাস। ২৪

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রস্রাবের সংক্রমণ
চারজন মেয়ের মধ্যে তিনজনই জীবনে একবার না একবার প্রস্রাবে সংক্রমণে ভোগেন, তবু তা নিয়ে খোলাখুলি কথা বলাও যেন লজ্জার। মেয়েরা বেশি ভোগেন বলেই কি? বেশি বয়সে অবশ্য ছেলেরাও কম ভোগেন না। কেন হয় সংক্রমণ? ঠেকানো যায় কি? চিকিৎসা কতদূর কার্যকর? লিখেছেন ডা. মৃন্ময়। ৪১

হাইপারভেন্টিলেশন কিংবা অ-কারণ শ্বাসকষ্ট
দেহে কোনো রোগ নেই কিন্তু শ্বাসকষ্ট আছে। তাই আবার হয় নাকি? হয়, এবং রীতিমতো মাথাব্যথার কারণও হয়ে ওঠে। কীভাবে সন্দেহ করবেন এই হাইপারভেন্টিলেশন সিনড্রোম-কে আর রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিই বা কী? লিখেছেন ডা. গৌতম মিস্ত্রী। ৪৬

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবেই সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৩
স্টেন্টবাজি ও অন্যান্য ভোজবাজি	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	৫
গলা জ্বলা ও GERD	ডা. অপূর্ব	১০
নবজাতকের পরিচর্যা	ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে	১৩
ডায়াবেটিস ও চোখ	ডা. সোহম সরকার	১৭
বুক ধড়ফড়	ডা. কুশল সেন	১৯
সীমান্ত জীবন: পর্ব ২	ডা. মৃন্ময়	২১
কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন		২৩
জন্মনিয়ন্ত্রণ: নারী ও সম্প্রদায়	ডা. সুমিতা দাস	২৪
বাড়ি থেকে বাজেট, কটাক্ষের লোক বেশি, ভাবার মানুষ কম	এষা মিত্র	২৯
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	৩১
প্রতিবিম্ব ও আমরা	রুমঝুম ভট্টাচার্য	৩৫
চেনা সাপ, চিকিৎসা এক অথচ সাফল্যের মধ্যেও ব্যর্থতা কেন?	দীপক চক্রবর্তী	৩৭
প্রাপ্তবয়স্কদের প্রস্রাবের সংক্রমণ	ডা. মৃন্ময়	৪১
সরকারি চিকিৎসা বেসরকারি চিকিৎসা ও ডাক্তারের 'লাভ'-স্টোরি		৪৪
হাইপার ভেন্টিলেশন কিংবা অ-কারণ শ্বাসকষ্ট	ডা. গৌতম মিস্ত্রী	৪৬
মি টু ড্রাগ	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	৫১
হরেকরকম		
টুথপেস্টে নিকোটিন		৫৩
টুকরো খবর		
ডাক্তারির ধকল সামলাতে না পেরে ভারতীয় ডাক্তাররা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছেন		৫৪
সুখী হতে চান? আপনার মোবাইলে ই-মেল অ্যাপ উড়িয়ে দিন		৫৫
ডেঙ্গু আটকাতে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড মশা		৫৫
গর্ভপাত সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন		৫৬
প্রথম স্থিতিশীল অর্ধ-কৃত্রিম জীবন		৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭,
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা-৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম(মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে

Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

কেন্দ্র সরকার স্টেন্টের দামে লাগাম লাগিয়েছে, প্রতি জেলায় স্বল্প মূল্যে জেনেরিক ওষুধের আউটলেট খোলার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ২০০৮-এ তা কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে, তাদের আর রক্ষা নেই—কড়া নিয়মকানুনের বাঁধনে তাদের বেঁধে ফেলা হবে—আর তারা মানুষের জীবন নিয়ে মুনাফা করতে পারবে না, গাফিলতিতে প্রাণ যাবে না কারও। নতুন ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রুলস অনেকদিন ধরে ঠান্ডাঘরে পড়ে থাকার পর তড়িঘড়ি করে পাশ করা হয়ে গেল। আগে থেকেই রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে বিনামূল্যে চিকিৎসার ঘোষণা করা হয়ে গেছিল। মানুষ অভিভূত, এমন তো দেখা যায়নি ৩৪ বছরের বাম-রাজত্বে।

বেসরকারি হাসপাতালের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভা, প্রতিদিন কড়া হুঁশিয়ারি, হাসপাতাল ও ডাক্তারদের গাফিলতির অভিযোগ নিয়ে খবরের কাগজের হেডলাইন্স, টিভি-র টকশো-র মাঝে কতগুলো কথা ভুলে যাচ্ছি আমরা বা আমাদের ভুলিয়ে, গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কর্পোরেট হাসপাতাল বা বেসরকারি হাসপাতালে যান কারা? উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের গতি কিন্তু সেই সরকারি হাসপাতালেই।

দুই-আড়াই দশক আগে কর্পোরেট হাসপাতাল ছিল না, বেসরকারি নার্সিং হোম ছিল হাতে গোনা। সরকারি হাসপাতালগুলোই ছিল চিকিৎসা-উৎকর্ষের কেন্দ্র। সে সময়েও সরকারি হাসপাতাল নিয়ে মানুষজনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। কিন্তু কী এমন ঘটল যে মানুষ সরকারি হাসপাতাল ছেড়ে ঘটিবাটি বিক্রি করে কর্পোরেট হাসপাতালে চিকিৎসা পেতে ছুটলেন?

নব্বই দশকের গোড়ায় আইএমএফ-বিশ্ব ব্যাংকের নিদান মেনে পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে সরে আসা শুরু করল সরকার। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ক্ষেত্র খুলে দেওয়া হল দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য। সরকার নিজের পরিকাঠামো উন্নত করা তো দূরে থাক, রক্ষণাবেক্ষণও না করে নিজের সম্পদ লাগাতে থাকল ব্যবসায়ীদের ব্যাবসা বাড়ানোয়—বেসরকারি হাসপাতাল-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ খোলায় ভরতুকি, করছাড় . . .।

অথচ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল, এখনও সম্ভব। স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় সামান্য বাড়িয়ে যে প্রাথমিক, মধ্যস্তরের ও অন্তিম চিকিৎসা পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় সমস্ত নাগরিককে দেওয়া যায়, তা হিসেব করে দেখিয়ে দিয়েছে সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে যোজনা কমিশন দ্বারা গঠিত উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল।

স্বাস্থ্য যখন পণ্য, তখন তা নিয়ে ব্যাবসা, মুনাফাবাজি হবেই। কর্পোরেট হাসপাতাল থাকবে অথচ তারা লাভ করবে না, এমনটা হয় নাকি? পাশাপাশি গরিব মানুষের জন্য বিনামূল্যের সরকারি ব্যবস্থা এবং সচ্ছল মানুষদের জন্য বেসরকারি ব্যবস্থা থাকলে, বেসরকারি ব্যবস্থা সরকারি ব্যবস্থার শাঁসকে শুষে নেয়—এমনটা কেবল আমাদের দেশের নয়, অন্য দেশেরও অভিজ্ঞতা।

সরকার এসএনসিইউ, এসএনএসইউ, মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল খুললেই কেবল হবে না। ডাক্তার পাবেন কোথা থেকে? এক হাসপাতালের ডাক্তারকে অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে

এমসিআই-কে কুমিরছানা দেখানো যায়, তাতে স্বাস্থ্যব্যবস্থা চলে না। সরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশকরা ডাক্তারকে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাবে কর্পোরেট, সরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা হাসপাতালে কমসময় দিয়ে বেশি সময় কাটাবেন বেসরকারি হাসপাতালে—এমনটাই তো হওয়ার, আর তাই-ই হচ্ছে।

এমন এক ব্যবস্থা চাই, চিকিৎসা যেখানে পণ্য নয়, যেখানে ডাক্তার ও রোগীদের মধ্যে পয়সার সম্পর্ক থাকবে না, ডাক্তার যেখানে রাষ্ট্রের কর্মচারী, যেখানে অসুখ হলে কোন ডাক্তারকে দেখাবেন তা ঠিক করা থাকবে, কোন রোগ হলে কোন ওষুধ দেওয়া বা কোন পরীক্ষানিরীক্ষা করা হবে তা নির্দিষ্ট করা থাকবে প্রামাণ্য চিকিৎসাবিধি বা স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইনে . . . । প্রাথমিক থেকে অন্তিম-সব স্তরের চিকিৎসাই সেখানে বিনামূল্যে। সরকার খরচ জোগাবে নাগরিকদের কাছ থেকে নেওয়া কর থেকে।

এমন এক ব্যবস্থাই হল—ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার বা সবার জন্য স্বাস্থ্য। স্টেন্টবাজি বা ভোজবাজি নয়, সবার জন্য স্বাস্থ্য-ই পারে দেশের মানুষকে সুস্থ রাখতে।

ভ্রম সংশোধন

স্বাস্থ্যের বৃত্তে ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৭ সংখ্যার প্রচ্ছদে 'আর্ন্তজাতিক' ছাপা হয়েছে, সঠিক শব্দটি হবে 'আন্তর্জাতিক'। সম্পাদকীয়তে '২০১৫ সালে নভেম্বর মাসে' ফিদেল কাস্ত্রো গত হয়েছেন—এরকম ছাপা হয়েছে, তা হবে '২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে'। ৩৩ পৃষ্ঠায় নিবন্ধ লেখকের নাম ছাপা হয়েছে 'ডা. বিল্পব', হবে 'ডা. বিপ্লব'। ৫৩ পৃষ্ঠায় আছে (ডান কলামে, নীচ থেকে ১০ লাইনে) '(ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০৩)', হবে '(ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৩)'।

অনিচ্ছাকৃত এই সমস্ত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

Advt.

সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব?

কেন্দ্র সরকার কমিটি বলছে

সম্ভব

সরকার বলছে

অসম্ভব

আমরা বলছি

সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই

আপনি?

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রচার কমিটি

স্টেন্টবাজি ও অন্যান্য ভোজবাজি

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

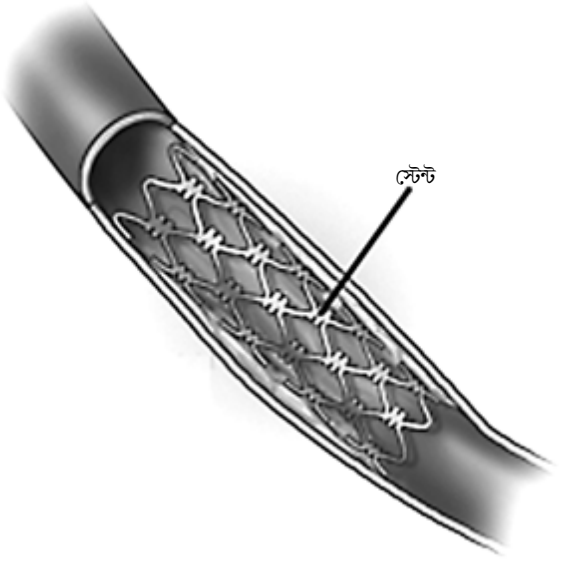

চিত্র ১. ধমনীর মধ্যে তারের খাঁচা—স্টেন্ট

বহুদিন ধরেই মানুষজনের মধ্যে কথা চালাচালি কানাঘুষো—বিশেষ করে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারির (সিএবিজি) রমরমা যখন শুরু হল—বাপরে! স্টেন্টের কী দাম! এক-একটা অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করতে কমসে-কম দেড় থেকে আড়াই লাখ টাকা। হবেই তো। স্টেন্টের দামই কোনোটা এক লাখ টাকা, কোনোটা-বা তিন লাখ টাকা বা তারও বেশি। কারও যদি তিনটে 'ব্লক' থাকে তার খরচ সাড়ে চার লাখ টাকা থেকে ছয় লাখ টাকা, কী তাকেও ছাপিয়ে যায়—সেটা নির্ভর করে, কে কেমন বেসরকারি হাসপাতালে (থ্রি-স্টার, ফোর-স্টার নাকি ফাইভ-স্টার) যান তার ওপর। এত বিপুল অঙ্কের টাকা খোলামখুচির মতো খরচ করা কী সাধারণ মানুষের কম্ম! টাকা তো আর গাছে ফলে না। কিন্তু কী করা যাবে—প্রাণের দায় বড়ো দায়। মানুষজন তাই উপায়ান্তর না পেয়ে ধার-দেনা করে, ঘটিবাটি বাঁধা দিয়ে কোনোমতে খরচের ধাক্কাটা সামলান। নিট ফল? সে-কথায় না হয় পরে আসা যাবে। কিন্তু এর মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল এক-একটা স্টেন্ট থেকে নাকি হাসপাতালগুলো ৬৫০ শতাংশ থেকে ৯০০ শতাংশ মুনাফা করে। ভাবা যায়! হাসপাতালগুলো যে মুনাফার লোভে মুড়িমুড়কির মতো অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করতে থাকে এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? এসব দেখেশুনে আচমকাই কর্তারা নড়েচড়ে বসলেন। এমন জুলুমবাজি তো বরদাস্ত করা যায় না। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (ওষুধ-বিষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের জাতীয় কর্তৃত্ব) স্টেন্টের দাম বেঁধে দিয়ে ফরমান জারি করলেন। কী সেই ফরমান?

আজ থেকে কোনো ওষুধ-মাখানো অনাবৃত তারের খাঁচার (drug-eluting) কিংবা জৈব-শোষণযোগ্য (bioresorbable) স্টেন্ট দেশের কোথাও স্থানীয় করসহ ২৯৬০০ টাকার বেশি দামে বেচা যাবে না। এমনকী হাসপাতাল, ডিলার বা নির্মাতাদের ঘরে যত স্টেন্ট মজুত আছে সেগুলো এই দামেই বেচতে হবে। অনাবৃত তারের খাঁচার (bare metal) স্টেন্টও ৭২৬০ টাকার বেশি দামে বেচা যাবে না। (এনএনএস, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭)।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে: সর্বোচ্চ দামের নীচে যেসব স্টেন্ট বিক্রি হয়, সেগুলোকে সেই একই দামে বেচতে হবে। বেঁধে দেওয়া সর্বোচ্চ দামের ওপর স্থানীয় কর ও ভ্যাট (VAT) ছাড়া অন্য কোনো মাশুল বসানো যাবে না। এনপিপিএ (National Pharmaceutical Pricing Authority) হাসপাতাল/নার্সিং হোম/ক্লিনিক-দের, যারাই করোনারি স্টেন্ট ব্যবহার করে, তাদের নির্দেশ দিয়েছে, বিলে নির্দিষ্টভাবে ও আলাদাভাবে স্টেন্টের দাম উল্লেখ করতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে ব্র্যান্ড নাম, প্রস্তুতকারক/আমদানিকারকের নাম, ব্যাচ নম্বর এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিবরণ। এর সঙ্গে হাসপাতাল/নার্সিং হোমের আঙিনায় সবার সামনে টাঙিয়ে দিতে হবে নির্মাতা/আমদানিকারকদের থেকে নেওয়া সমস্ত স্টেন্টের দামের তালিকা।

স্টেন্টকে শিডিউল-১ ড্রাগ হিসেবে চিহ্নিত করার পর জানুয়ারি মাসে স্টেন্ট-এর সঙ্গে জড়িত সকলকে নিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনার শেষে স্টেন্ট-এর দাম বেঁধে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসে, স্টেন্ট সরবরাহের প্রতিটি ধাপে অনৈতিকভাবে দাম বাড়ানো হয়; ফলে অযৌক্তিক চড়া দামে স্টেন্ট কিনতে বাধ্য হয়ে রোগীরা পড়েন চরম আর্থিক দুর্দশায়। এর সঙ্গে আছে ডাক্তার-রোগীর মধ্যে স্টেন্ট-সংক্রান্ত খবরাখবর আদান-প্রদানের মধ্যে নানারকম বিভ্রান্তিমূলক অসংগতি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে—জনস্বার্থে, রোগীরা যাতে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন, তাই স্টেন্ট-এর দাম বেঁধে দেওয়া হল। বীরেন্দর সাংওয়ান দিল্লি হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন। বিষয়: স্টেন্ট-এর দাম বেঁধে দেওয়া আর স্টেন্টকে জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধ তালিকার আওতায় আনা। এইটি বিবেচনা করে করোনারি স্টেন্টকে জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধ তালিকার আওতায় আনা হয়েছে।

ফরমান জারির পরে পরেই

ফরমান পেয়েই তো স্টেন্ট-নির্মাতা, হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের মাথায় হাত। তড়িঘড়ি নির্মাতারা ও পরিবেশকরা হাসপাতালগুলো থেকে সর্বাধুনিক স্টেন্টগুলো তুলে নিলেন। কী কারণ? না, স্টেন্টগুলোতে নতুন করে লেবেল সাঁটতে হবে। যেসব হাসপাতাল থেকে স্টেন্ট তুলে নেওয়া গেল না, তাদেরকে মুখে বলে দেওয়া হল দামি ও উঁচু মানের স্টেন্টগুলো যেন রোগীদের না দেওয়া হয়। অথচ এনপিপিএ (National Pharmaceutical Pricing Authroity)-র স্পষ্ট নির্দেশ: নির্মাতা, আমদানিকারক ও খুচরো

ব্যবসায়ীরা এই মুহূর্ত থেকে বেঁধে-দেওয়া দামে স্টেন্ট বেচবেন; কোনো কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা যেন না করা হয়। এই মর্মে এনপিপিএ সব রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছে: বাঁধা-দামে রোগীরা যেন সবরকমের স্টেন্ট পায়।

ওদিকে হৃদ্‌রোগবিশারদরা বলছেন: বিভিএস (bioresorbable vascular scaffold) স্টেন্ট—যা রোগগ্রস্ত ধমনিকে সারিয়ে শরীরেই শোষিত হয়ে যায়—কোথাও মিলছেই না। 'কোম্পানি ওগুলো তুলে নিয়ে গেছে নতুন দাম সাঁটবে বলে কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, ওগুলো আর হাসপাতালে ফিরে আসবে বলে মনে হয় না।' বলছেন বম্বে হাসপাতালের এক প্রবীণ হৃদ্‌রোগবিশারদ। (টিএনএন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭) ডিইএস (drug eluting stent)-এর সর্বশেষ-রূপগুলোও মুম্বাইয়ের বেশির ভাগ হাসপাতাল থেকে এক নিমেষে উধাও।

২৯৬০০ টাকায় স্টেন্ট-এর দাম বেঁধে দেওয়ার আগে পর্যন্ত এই দু-রকম স্টেন্ট-এরই দাম ছিল দেড় থেকে দু-লাখ টাকা। বুধবার অনেক হাসপাতালেই অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি বাতিল হয়ে গেছে দাম নিয়ে নির্মাতা ও সরবরাহকারীদের মধ্যে টানাপোড়েনের ফলে।

মুম্বাই মেট্রোপলিটান এলাকায় বছরে প্রায় ১২০০০ অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি হয়। বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের বেশির ভাগ হাসপাতালেই পুরোনো স্টেন্ট দিয়েই কাজ চালাতে হয়। গত দু-বছর ধরে, যেগুলো সেকেলে হয়ে গেছে বলে, আর ক্যাথ-ল্যাব-এ রাখা হত না।

যে ৫২ রকমের ডিইএস ব্র্যান্ড এ-দেশে আমদানি হয়, বিশ্বমানের নিরিখে সেগুলোর গুণগত মানে ইতরবিশেষ তেমন নেই অথচ দামে এত বিপুল ফারাক কেন?—এটা একটা বিষম ধাঁধা—মন্তব্য করেছে এনপিপিএ। অথচ আমদানি-করা ডিইএস-এর জন্যে খরচ পড়ে স্টেন্ট পিছু মাত্র ১৬৯১৮ টাকা।

হাসপাতালগুলোর কারসাজি

স্টেন্ট-এর দাম আর তো ৩০০০০ টাকার ওপর নেওয়া যাবে না। মুনাফা তো একদম তলানিতে ঠেকে গেল! এই ডাহা লোকসান কী করে ঠেকানো যায়। ফন্দিফিকির আঁটা চলতে লাগল। ৫ কোটি দামের ক্যাথল্যাব মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কর্মীদের মাইনে বাদ দিয়ে বছরে অন্তত ২৫ লাখ তো চাই। সে জন্যে বাড়িয়ে দাও অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির প্রক্রিয়াগত খরচ। এখন থেকে বিলে বাড়তি যোগ হবে জুনিয়র টেকনোলজিস্ট চার্জ, জুনিয়র কার্ডিয়োলজিস্ট চার্জ, সিনিয়র কার্ডিয়োলজিস্ট চার্জ, ক্যাথল্যাবে থাকাকালীন চার্জ, বাড়তি সার্জন-এর চার্জ ও হাসপাতালে বাড়তি সময়ে থাকার চার্জ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হায়দ্রাবাদের এক ডাক্তারের মন্তব্য: 'স্টেন্ট ব্যাবসায়ে হাসপাতালগুলোয় বিশাল মুনাফা হয়, কিন্তু এনপিপিএ-এর নির্দেশের পর তাদের ব্যাবসাকে ঢেলে সাজাতে হবে। একটা উপায় হচ্ছে সবরকম প্রক্রিয়ার দাম বাড়িয়ে দেওয়া।'

শুধু কী তাই। যে সার্জারি-উপকরণগুলো একবার ব্যবহার করেই ফেলে দিতে হয় (ডিসপোজেবল) সেগুলোকে ওরা বার বার ব্যবহার করে। যেমন ক্যাথেটার, গাইড অয়্যার, বেলুন ইত্যাদি। আর প্রত্যেক রোগীর থেকে নতুনের দাম নিয়ে নেয়। এই কায়দায় ওদের উপকরণ-পিছু ২০০০০-৩০০০০ টাকা লাভ হয়।

টিওআই বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে, এই ব্যাবসার চাবিকাঠি যাঁদের হাতে, যাঁদের মধ্যে কার্ডিয়োলজিস্টরাও আছেন, দু-দিন আগেই গোপনে শলা-পরামর্শ করেছেন কী উপায়ে এই নির্দেশকে কলা দেখানো যায়—সাপও মরে অথচ লাঠিও ভাঙে না।

তেলেঙ্গানার ১৪৫টা ক্যাথল্যাব সেন্টারে মাসে ৬০০০ স্টেন্ট লাগে, যার মধ্যে রাজ্য সরকারের টাকায় আরোগ্যশ্রী প্রকল্পের ১০০০ স্টেন্টও আছে। এনপিপিএ দাম বেঁধে দেওয়ায় হাসপাতালগুলো পড়েছে মহা আতান্তরে—মন্তব্য করেছেন এই ব্যাবসার খোঁজখবর রাখেন এমন একজন।

এইজন্যেই ফেটে গেল এতদিন সযত্নে লুকিয়ে রাখা বোমাটা। স্টেন্ট ব্যাবসা এতটাই মুনাফা দেয় যে আমেরিকা থেকে আমদানি কিছু কিছু ব্র্যান্ডে ৮০০ শতাংশের ওপরও মুনাফা হয়। ম্যাক্সকিয়োর গ্রুপ হাসপাতালের এম ডি ডা. অনিল কৃষ্ণ বলেন: '১ লাখ টাকার ওপর দামের দামি স্টেন্টগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে ৪০০০০ টাকায় সস্তা দামের স্টেন্ট এখনও পাওয়া যাচ্ছে। এখন আর জৈব-শোষণযোগ্য স্টেন্ট বাজারে নেই, বহুজাতিক সংস্থাগুলো মনে করছে অযৌক্তিকভাবে দাম এতটা কমিয়ে দেওয়ায় ভারতের বাজার তাদের পক্ষে ব্যাবসা করার অনুপযুক্ত।' (টিএনএন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭) তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁদের গোষ্ঠীতে অনেক কুলে কালি দেওয়ার লোক আছেন, যাঁরা পেশার বদনাম ছড়াচ্ছেন; কিন্তু তিনি এনপিপিএ-এর সঙ্গে কোনোমতেই একমত হতে পারছেন না যে হৃদ্‌রোগ চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সকলেই ওই এক গোত্রের।

স্টেন্ট-নৈতিকতা নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যে বিতর্ক

এনপিপিএ স্টেন্ট-এর দাম বেঁধে দেওয়ার ফলে শুধু যে হাসপাতাল আর স্টেন্ট-নির্মাতারা জোর ঘা খেয়েছে তাই নয়, স্টেন্ট বসানোর যৌক্তিকতা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও তুমুল বিতণ্ডা বেঁধে গেছে। এদেশে স্টেন্ট বসানো হবে কি হবে না, তা ঠিক করেন একজন মাত্র কার্ডিয়োলজিস্ট। কিন্তু কিছু উন্নত দেশে পদ্ধতিটা অন্যরকম। সেখানে একটি 'হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ দল' সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেন। যে দলে থাকেন একজন কার্ডিয়োলজিস্ট, একজন কার্ডিয়োথোর‍্যাসিক সার্জন, একজন কার্ডিয়্যাক অ্যানাস্থেসিয়োলজিস্ট, একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান ও একজন বাইরের লোক। এ দেশের সবথেকে খারাপ ব্যাপারটা হল, ঠিকঠাক রীতি মেনে স্টেন্ট বসানো হচ্ছে কী না তার নজরদারি করার জন্যে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। স্টেন্ট বসানোর কোনো মেডিক্যাল অডিটও হয় না।

নিজাম'স ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস-এর কার্ডিয়োথোর‍্যাসিক সার্জারির বিভাগীয় প্রধান ডা. আর ভি কুমার বলেছেন: 'কয়েকটি উন্নত দেশে যেমন করা হয় তেমনটি না করে, তৃতীয় পক্ষের নজরদারি, মেডিক্যাল অডিট, হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ দলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ব্যতীত রোগীর বুকে স্টেন্ট বসানোতেই স্টেন্টের বহুল অপব্যবহার হচ্ছে না তো?' (টিএনএন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)।

এ প্রসঙ্গে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পত্রিকার ৩৩ তম সংখ্যায় ডা. গৌতম মিস্ত্রীর 'বুকের ব্যথার ব্যাবসা' নিবন্ধটিতে একটু চোখ বোলানো যেতে পারে। তিনি লিখছেন: 'তবে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি কি একটি সর্বতোভাবে

বাতিলযোগ্য চিকিৎসা? উত্তর হল, না। হার্ট অ্যাটাকের অব্যবহিত পরে চটজলদি প্রাইমারি অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে ফেলাটা সর্বোত্তম চিকিৎসা। সবরকমের ওষুধের দ্বারা বুকের ব্যথার উপশম করা না গেলেও ক্রনিক (ইস্কিমিক) হৃদ্‌রোগে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি সাময়িকভাবে বুকের ব্যথার উপশম করতে পারে সেটাও ফেলনা নয়। এর বাইরে হৃদ্‌রোগের যে সুবিশাল অংশ পড়ে থাকে তাদের অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে বিশেষ কিছু পাবার থাকে না, কিছু ওষুধপত্র ব্যবহার করলেই চলে। রোগটি যে নির্মূল হচ্ছে না সেটা বলাই বাহুল্য। অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি অথবা গুটিকয় অতিরিক্ত ওষুধে—এ দুটোর দ্বারা যদি সমমানের কর্মক্ষম জীবন উপহার দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে চিকিৎসকের কর্তব্য হল দুটো বিকল্পকে রোগীকে বুঝিয়ে বলা।' (পৃ. ২১)।

বিসমিল্লায় গলদ

দাম বেঁধে দেওয়ায় স্টেন্ট-এর ব্যাবসাতে রোগীর পকেট লুঠ করে হাসপাতালগুলো কীভাবে মুনাফার পাহাড়ের ওপর চড়ে বসে, তার বেশ কিছু কথা ফাঁস হয়ে গেল। অনেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যবস্থা নেওয়াকে তারিফ জানালেন। স্টেন্ট নিয়ে হাসপাতালগুলোর মুনাফাবাজি কিছুটা মার খেল—এ কথাও সত্যি। কিন্তু এতেই কি সব মুশকিল আসান?

আজ গোটা দুনিয়া জুড়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবায় পুঁজিপতিরা বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করছেন। কারণ একটাই। এই পরিষেবা-ক্ষেত্রে মুনাফার অঙ্ক এতটাই চড়া যে পুঁজিপতিদের চোখও কপালে উঠে যায়। অন্য আর পাঁচটা ব্যাবসার থেকে এই ক্ষেত্রটি যে অনেক বেশি উর্বর সেটা বুঝতে তাঁদের এক মুহূর্তও সময় লাগেনি। সেইজন্যেই দেখা যায় বিশ শতকের শেষ দিক থেকে এদেশে বেসরকারি স্বাস্থ্য উদ্যোগের বোলবোলাও। কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের সরকারগুলোই এদের হাতে ধরে সাদরে ডেকে এনেছেন স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের অছিলায়। এ কথা তো স্পষ্ট—যাঁরা

কমিশনের মনে হয়েছিল যে রাষ্ট্র অনায়াসে দেশের আপামর মানুষজনের স্বাস্থ্য রক্ষার ভার নিজের হাতে নিতে পারে। তাহলে মানুষজন যে পকেটের কড়ি ফেলে চিকিৎসা করাতে করাতে সর্বস্বান্ত হওয়ার পথে পা বাড়ায়, তা ঠেকানো যায়।

ব্যাবসা করতে এসেছেন, তাঁরা ব্যাবসাই করবেন। চাইবেন আরও বেশি বেশি মুনাফা, সে ক্ষেত্র স্বাস্থ্যই হোক কী শিক্ষা কিংবা অন্য কিছু। গাছের গোড়ায় সার-জল দিয়ে পুষ্টি বাড়িয়ে তারপর দু-একটা ডালপালা ছাঁটলে কী আর তাকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা যায়, বরং আরও ফনফনিয়ে বেড়ে ওঠে। স্টেন্টের বেলাও তাই ঘটছে। একটা দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে তো কী হয়েছে? আর দশটা থেকে ওই মুনাফা-ঘাটতি পুষিয়ে নেব—সে পথেই হাঁটছে হাসপাতালগুলো, স্টেন্ট-নির্মাতা ও সরবরাহকারীরা, সঙ্গে আছেন বেশ কিছু লোলুপ হৃদ্‌রোগবিশারদ।

অথচ ডা. শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশনের সুপারিশের বেলায় কেন্দ্রীয় সরকার চোখে ঠুলি এঁটে কানে তুলো গুঁজে চুপটি করে বসে আছে। কী সুপারিশ করেছিল কমিশন? কমিশনের মনে হয়েছিল যে রাষ্ট্র অনায়াসে দেশের আপামর মানুষজনের স্বাস্থ্য রক্ষার ভার নিজের হাতে নিতে পারে। তাহলে মানুষজন যে পকেটের কড়ি ফেলে চিকিৎসা করাতে করাতে সর্বস্বান্ত হওয়ার পথে পা বাড়ায়, তা ঠেকানো যায়। আর এর জন্যে সরকারকে খুব বেশি একটা কিছু করতে হবে না। স্বাস্থ্যখাতে সরকার এখন (২০১১) যা ব্যয় করে (মোট স্থূল উৎপন্ন বা জিডিপি-র ১.৪ শতাংশ) তার থেকে ২০১৭-য় মাত্র কিছু শতাংশ বেশি (জিডিপি-র ২.৫ শতাংশ) ও ২০২২-এর মধ্যে ৩ শতাংশ বরাদ্দ করলেই সরকার সবার জন্যে স্বাস্থ্যের ভার নিজের হাতেই নিতে পারে। কেন্দ্রে পূর্ববর্তী ইউ পি এ সরকারের আমলেই ডা. শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশন এই সুপারিশ করেছিল। সেই সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে টালবাহানা করছিল। শুধু তাই নয় দ্বাদশ পরিকল্পনায় তারা যে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা নীতি নিল, তা আসলে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের দিকেই পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ল। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ জিডিপি-র ১.৪ শতাংশ থেকে সামান্য বাড়িয়ে করা হল ১.৫৮ শতাংশ। বিশদে জানার জন্যে পড়ুন: শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ প্রকাশিত 'সবার জন্য স্বাস্থ্য: আমাদের অধিকার' প্রচারপত্রটি। এর মধ্যেই কেন্দ্রে এসে পড়ল বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। তারা এসে প্রথমেই যেটা করল: স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ ২০ শতাংশ (৫০০০ কোটি টাকা) কমিয়ে দিল। স্বাস্থ্যখাতে খরচ ২০১১-র জিডিপি-র ১.৪ শতাংশ থেকে আরও কমিয়ে ১.০৪ শতাংশ করে দিল। স্পষ্টই বোঝা যায় কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কোনোরকম ইচ্ছেই তাদের নেই। এদেশে সরকারের মদতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পুঁজিপতিরা যে আরও অনেকদিন ধরেই দাপিয়ে বেড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অনেকেই জানি, হয়তো অনেকে জানি না যে পৃথিবীর মোট ১৯৬টি দেশের মধ্যে ৯৩টি দেশে সবার জন্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু আছে। তার মধ্যে ইংল্যান্ডের মতো ধনী দেশ যেমন আছে, তেমনি আছে গরিব দেশ শ্রীলঙ্কা। সেসব দেশে প্রাথমিক স্তর, মধ্যম স্তর এবং অন্তিম স্তর—সব স্তরেরই মানুষজনের চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে। সেসব দেশে মানুষজনকে পকেটের কড়ি ফেলে চিকিৎসা করাতে হয় না। প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানের জন্যে রাষ্ট্র নানা বিকল্প ব্যবস্থা নেয়। স্বাস্থ্যের অধিকার আমাদের একটি মানবাধিকার। সে অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র তার দায়বদ্ধতা এড়াতে পারে না। ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আলমা-আটায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ২০০০-এর মধ্যে 'সবার জন্যে স্বাস্থ্য'-র কথা ঘোষণা করে। তাতে ভারতও এক স্বাক্ষরকারী দেশ। সতেরো বছর পেরিয়ে গেল কিন্তু আমাদের সরকার এখনও নানাভাবেই মানুষজনের স্বার্থ ও অধিকার উপেক্ষা করে দেশি-বিদেশি পুঁজিকে মদত দিয়েই চলেছে। যদিও মাঝে মাঝে স্টেন্ট-এর দাম বেঁধে দেওয়ার মতো এমন কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে যাতে মনে হতে পারে সরকার স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে।

রাজ্যে ভোজবাজি

কেন্দ্র এত 'জনদরদি' কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে; এ রাজ্যের 'মা-মাটি-মানুষের' সরকারই বা পিছিয়ে থাকে কী করে? কেননা বেশ আগে থেকেই সরকারি

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার খোলনলচে ঢেলে সাজাবার জন্যে একের পর এক ফরমান জারি করেছে, এমনকী 'ফ্রি'-তেও চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদেরই একাংশের অভিমত: ফ্রি-তে 'হ্যাঁচ্চো'র চিকিৎসা ছাড়া আর কোনো চিকিৎসাই করা যায় না। হবে কী করে? স্বাস্থ্য বিভাগের পরিকাঠামোর ব্যবস্থাটাই এমন যে সেখানে হাজার-এক ভালো ভালো ফরমান হাসপাতালের এ-গেট দিয়ে ঢুকে ও গেট দিয়ে বেরিয়ে যায়। কথাটা যে সরকারের কর্তারা জানেন না তাও নয়। সরকারি হাসপাতালের হালহকিকত নিয়ে কিছু কথা না হয় পরে বলা যাবে। হালে স্বাস্থ্য রক্ষা নিয়ে রাজ্য সরকার কীভাবে ফের উঠেপড়ে লাগলেন, সেটাই বরং বলা যাক।

শুরুটা হয়েছিল হাসপাতাল ভাঙচুর দিয়ে। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে পেটের ব্যথায় ছটফট করতে থাকা কিশোরী সায়েকা পরভিনকে সিএম আরআই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার অপারেশনের জন্যে সি এমআরআই এক লক্ষ টাকা চেয়েছিল। সেই টাকা জোগাড় করতে না পারায় রোগিণীকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়েছিল বলে রোগিণীর বাড়ির লোকের দাবি। এমনকী তার শরীরের অবস্থা যখন খুব খারাপ হতে শুরু করে তখন কী চিকিৎসা হয়েছিল বা আদৌ হয়েছিল কি না—কিছুই নাকি জানানো হয়নি বাড়ির লোককে। রোগিণী মারা যায়। এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে মারধোর ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনায় এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলোর বিল-এর অসংগতিতে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বেসরকারি হাসপাতালগুলোর কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে (২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ধরে ধরে কর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তাকে অনেকেই বেনজির বলে মনে করছেন। বস্তুত, তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কর্তারা কীরকম ফাঁপড়ে পড়েছিলেন তা টিভির পর্দায় ও পরের দিনের কাগজে মানুষজন দেখেছিলেন। দু-একটি নমুনা:

অ্যাপেলো হাসপাতাল

প্রশ্ন: আপনাদের বিল বেড়েই যাচ্ছে। বাংলাদেশ অভিযোগ করেছে। কেন? পাঁচতারা হোটেলেও এত খরচা হয় না।

কর্তৃপক্ষের উত্তর: আমরা দামি দামি রোবোটিক সার্জারি, পেটে সিটিস্ক্যান ও রেডিয়োথেরাপি মেশিন ব্যবহার করি, সে জন্যে খরচ বেড়ে যায়। এছাড়া বহু জায়গা থেকে সংকটাপন্ন রোগীদের আমাদের এখানে পাঠানো হয়, তাদের চিকিৎসাও বেশ খরচের ব্যাপার।

প্রশ্ন: মেশিন তো কেনেন ব্যাবসার জন্যে। টাকা তোলার জন্যে একটু ধৈর্য ধরুন। কতগুলো মেশিন কিনেছেন যে বিল এত চড়া? সাধারণ মানুষের জন্যে তো একটা বাজেট বিভাগ খুলতে পারেন।

উত্তর: প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বাজেট বিভাগ খুলব।

বেলভিউ ক্লিনিক

মুখ্যমন্ত্রী: আপনাদের পরিষেবা খারাপ হয়েই চলেছে। অনেক বাড়তি খরচ, নার্সিং পরিষেবাও ভালো নয়। আমি একটুও সন্তুষ্ট নই।

উত্তর: আমাদের নার্সরা সব সরকারি হাসপাতালে চলে যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী: এতে সরকারের কী করার আছে! আপনারা ভালো মাইনে দিন ওরা থেকে যাবে।

সিএমআরআই

মুখ্যমন্ত্রী: ভাঙচুরের ব্যাপারটা ঠিক হয়নি। আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। কিন্তু আপনাদের বিলও তো খুব চড়া।

উত্তর: কথা দিচ্ছি বিলে স্বচ্ছতা আনব আর সরকারের সব পরামর্শ খোলা মনে নেব।

আমরি

প্রতিনিধি: আরও স্বচ্ছতা দরকার—আমরা একমত। একটা ফিক্সড প্যাকেজ শুরু করেছি। এতে প্যাকেজের ওপর একটাকাও বেশি পড়বে না।

মুখ্যমন্ত্রী: রোগীর অবস্থা খারাপ হলেও টাকা নেবেন না? নাকি একরকম টাকায় ভর্তি করবেন আর নেবেন আর একরকম।

উত্তর: না ম্যাডাম।

রুবি হাসপাতাল

মূখ্যমন্ত্রী: এ বার রুবি মানে যেখানে মানুষ স্যাটস্যাট চলে যায় আর বিল বেড়ে যায়।

প্রতিনিধি: আমরা ম্যাডাম রোড ট্র্যাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বিনা পয়সায় চিকিৎসা করছি।

মুখ্যমন্ত্রী: রুবির চার্জ খুব বেশি। বিল বাড়ানো নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ। রুবি রোগীদের রেকর্ড দিচ্ছে না। আপনারা ই-প্রেসক্রিপশন, ই-রেকর্ড চালু করুন।

মেডিকো

মুখ্যমন্ত্রী: জমি নিয়েছেন নিখরচায়?

উত্তর: না টাকা দিয়ে কিনেছি।

মুখ্যমন্ত্রী: লিজ নিয়েছেন বলুন।

উত্তর: হ্যাঁ, কিস্তিতে।

মুখ্যমন্ত্রী: অনেক টাকা আপনাদের। অনেক ইনকাম আপনাদের। তাহলে ইনস্টলমেন্ট কেন?

উত্তর: থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, থ্যাঙ্ক ইউ।

মুখ্যমন্ত্রী: কিডনি চক্র বন্ধ হয়েছে আপনাদের?

উত্তর: কোনোদিনই ছিল না।

মুখ্যমন্ত্রী: ছিল তো। কেন্দ্র কাগজ পাঠিয়েছে আমাদের। কোর্টের ফিক্সড ল ছিল না বলে পার পেয়ে গিয়েছেন। ফারদার যেন না হয় এই সব চক্র।

কে পি সি

মুখ্যমন্ত্রী: লোক মরে গেলেও ছাড়েন না আপনারা। . . . মরে গেলে আর কার থেকে নেবেন।

উত্তর: ইয়েস ম্যাডাম। এটা একবার হয়েছিল তারপরে আর কোনোদিনই হয়নি। আর কোনোদিন হবেও না।

হাসপাতালগুলো সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী যা যা বলেছেন, তা এই রাজ্যের মানুষজনের সকলেরই কম-বেশি জানা। কিন্তু প্রশ্নের উত্তরগুলো একটু খুঁটিয়ে পড়লে বেশ মজা পাওয়া যায়। সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নগুলোকে মরিয়া হয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেখানে পেরে ওঠেননি

সেখানে উত্তরগুলো এতটাই জোলো যে তা পাঠকের হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। কেউ বলেছেন, দামি মেশিনের জন্যে বিল বেশি; কেউ বা নার্সরা চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে বলে পরিষেবা ভালো দিতে পারছে না, পরোক্ষে মেনে নিচ্ছেন রোগীদের কাছ থেকে সরকারি হাসপাতালের থেকে অনেক গুণ বেশি টাকা নিলেও নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের মাইনে দেন খুবই কম। আর একটা জবাব তুলনাহীন। মুখ্যমন্ত্রীর স্যাটায়ার 'স্যাটাস্যাট চলে যায়'-এর জবাব: পথ-দুর্ঘটনার বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয়। অর্থাৎ পথ-দুর্ঘটনায় বিনা পয়সায় চিকিৎসা করলে রোগী তো মারা যাবেই। তবে এ সওয়াল জবাব থেকে স্পষ্ট, হাসপাতাল কর্তারা, প্রত্যক্ষে হোক বা পরোক্ষে, অভিযোগগুলোর সত্যতা মেনে নিয়েছেন।

দু-দিন যেতে না যেতেই অ্যাপেলো হাসপাতালের নামে জুলুমের অভিযোগ। অ্যাপেলো থেকে রোগী সঞ্জয় রায়কে পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় বকেয়া বিলের কয়েক লক্ষ টাকা না দেওয়া পর্যন্ত অ্যাপেলো রোগীকে ছাড়তেই চায়নি। সারাদিন টালবাহানা করে রাত ন-টায় তাঁকে ছাড়া হয়। পরদিন ভোরে পিজি-তে রোগী মারা যায়। মল্লিকবাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালের নামে রোগীর পরিজনরা অভিযোগ করেন, চিকিৎসক বাইরে অথচ তাঁর নামে বিলে রোজ এক হাজার টাকা ভিজিটিং চার্জ। বর্ধমানের পিজি নার্সিংহোমে তপন লেট পেশায় কৃষিজীবী তাঁর সদ্যপ্রসূতি মেয়ে চুমকিকে ভর্তি করান। বিল হয়েছিল ৪২০০০ টাকা। অত টাকা জোগাড় করতে না পেরে তপনবাবু গলায় দড়ি দেন। এই ঘটনাগুলোও আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মুখ্যমন্ত্রীর 'ধমকচমককে' এরা কেউই খুব একটা পরোয়া করে না যদিও মৃত সঞ্জয়ের স্ত্রী রুবি রায় ফুলবাগান থানায় এফআইআর করলে রাজ্য সরকার তদন্ত শুরু করেন। সেই চাপে অ্যাপেলোর পুর্বাঞ্চলের সিইও রূপালি বসু ইস্তফা দেন।

দাওয়াই: নয়া স্বাস্থ্য বিল

নতুন স্বাস্থ্য বিলের খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, বামফ্রন্ট সরকার ২০১০-এর ২৯ জুলাই যে বিল 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন)' পাশ করিয়েছিল তার সঙ্গে নতুন বিলের বিশেষ তফাত নেই। যদিও তখন তৃণমূল কেন্দ্রে আইন না হওয়া পর্যন্ত এই বিল পাশ করানোর কোনো যুক্তি নেই বলে এর বিরোধিতা করেছিল।

বিল এনে আইন করে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের মুনাফাবাজির কতটা ঠেকানো যাবে সে নিয়ে ঘোর সংশয় আছে। সংশয়ের কারণও আছে। বিল এনে আইন করলে, আইন মাফিক সুবিচারের আশায় মামলা করতে হয়। মামলা নিম্ন আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়াতে পারে। যে মানুষজন চিকিৎসার খরচাই জোগাতে পারেন না তাঁরা মামলার এত খরচ জোটাবেন কোথা থেকে? অনাবাসী ডা. কুণাল সাহা তাঁর স্ত্রী অনুরাধা সাহার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এনেছিলেন আমরি-র বিরুদ্ধে। সে মামলা চলেছিল দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। ডা. সাহা, একে ডাক্তার তায় স্বচ্ছল মানুষ, তিনি পেরেছিলেন। আমজনতার পক্ষে কি তা আদৌ সম্ভব? ঢাকুরিয়া আমরিতে আগুন লেগেছিল। তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল। ফের তো তাদের ব্যাবসা চালাতে দেওয়া হল। ব্যাবসার রমরমারও কিছু কমতি নেই। এছাড়া আইনের ফাঁকফোকর গলে বেরিয়ে আসার কায়দাটা যে উঁচুতলার মানুষজনের ভালোরকম রপ্ত, সে তো আমরা নিত্যরোজই দেখি। তার ওপর সম্প্রতি একটি বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্‌বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন: তিনি বেসরকারি উদ্যোগের বিরোধী নন তবে সকলের থেকেই নৈতিকতা কাম্য। স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ব্যাবসা করে তাদের থেকেই নৈতিকতা আশা করা আর সোনার পাথরবাটি চাওয়া একই কথা। ব্যাবসার লক্ষ্যই হল মুনাফা। আর নৈতিক উপায়ে কখনোই মুনাফা হয় না। সুতরাং বেসরকারি ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে মানুষজনের 'সবার জন্যে স্বাস্থ্যের অধিকার' সুনিশ্চিত করা যায় না।

বিকল্প

রাজ্য সরকার সরকারি হাসপাতালগুলোতে জেনেরিক ওষুধ চালু আরও টুকিটাকি কয়েকটি সংস্কার আনার অনেক আগে থেকেই (১৯৯৫) শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ যে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে তার মূল কথাগুলো এইরকম:

- চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে যুক্তিসম্মত চিকিৎসা;
- রোগীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেওয়া;
- দরকার না হলে পরীক্ষানিরীক্ষা না করা। দরকার পড়লে যতটা পারা যায় কম দামে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা;
- জেনেরিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করা। ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন বা 'মি টু ড্রাগস' ব্যবহার না করা;

ডাক্তারে ফি ১০ টাকা, বিশেষজ্ঞ দেখানোর দরকার পড়লে আরও ১০ টাকা।

এইভাবে আজও চলছে। উত্তরবঙ্গে তিন জায়গায় মাসে একটা করে মেডিক্যাল ক্যাম্প চলছে। বাঁকুড়ায়, সুন্দরবনের সরবেড়িয়ায় মোটামুটি এই একই পদ্ধতিতে চিকিৎসা চলে। আরও বেশ কিছু সংস্থা এই একই পথে পা বাড়াচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য হলেও কিছু গরিব মানুষ অন্তত চিকিৎসার সুযোগটুকু পাচ্ছেন। এই পরীক্ষানিরীক্ষাও সরকারের সামনে তুলে ধরে, সামান্য অর্থেও চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব।

রাজ্য সরকারের মানুষজনের প্রতি আন্তরিক দরদ থাকলে ডা. শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এ রাজ্যে অন্তত 'সবার জন্যে স্বাস্থ্য' প্রকল্পটি কাজে লাগানোর জন্যে এগিয়ে আসতে পারে। এ রাজ্যে স্বাস্থ্য-বাজেট খতিয়ে দেখে কতদূর কী করা যায় না যায় তা নিয়ে আলোচনা চালাতে পারে। যদি সত্যিই তা করা হয় তাহলে আমরা আগ্রহী। শুনছি নাকি নিগ্রহের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ডাক্তারি ছাত্রদের তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্যে মারামারি শিখতে হচ্ছে। আমজনতা যদি তাদের হক আদায়ের জন্যে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হতে চায়, তবে তাদের কি খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে!

তথ্যসূত্র: *টাইমস অভ ইন্ডিয়া, টাইমস নিউজ নেটওয়ার্ক, আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৪ ফেব্রুয়ারি-৩ মার্চ, ২০১৭।

যে যে জায়গায় শুধু 'হাসপাতাল' লেখা হয়েছে সেগুলোকে 'বেসরকারি হাসপাতাল' পড়তে হবে। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

লেখক: প্রাবন্ধিক ও অভিধানকার।

গলা জ্বলা ও GERD

''গ্যাসের রহস্য কথা (অ) মৃত সমান।/গৌতম ডাক্তার কহে, শুনে পুণ্যবান।'' গ্যাসের রহস্য নিয়ে গৌতম ডাক্তার *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র তিরিশ নম্বর সংখ্যায় যা বলে গিয়েছেন তার পর গ্যাস নিয়ে আর নতুন কিছু বলার চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু না। তাই আমরা এবার শুনব গ্যাসের ভাই অম্বলের কেচ্ছার কথা—লিখেছেন **ডা. অপূর্ব**।

চিত্র ১. গ্যাস ও অম্বলে বুক জ্বালা

বাঙালির ঝালে-ঝোলে-অম্বলের সেই অম্বল এ নয়। এ হল সেই গ্যাস-অম্বল-বুকজ্বালার অম্বল, যার বিষাক্ত ধোঁয়ায় বাঙালিমাত্রেই উদ্ভ্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত। লেবু-জোয়ান, আমলকি থেকে শুরু করে র‍্যান্টাক জিস্ট্যাক ওমেজ প্যান-ডি সবই এই অম্বলের বিরুদ্ধে নিরুপায় হার স্বীকার করেছে।

গ্যাস আর অম্বল যেন যমজ, এ ওকে ছাড়া চলে না ওকে ভাবা যায় না একে ছাড়া, আবার কখনো কখনো দুইয়ে মিলে তালগোল পাকিয়ে কী যে হয়, দু-জনকে আলাদা করে চেনাই যায় না—একে মনে হয় ও, ওকে মনে হয় এ। হ্যাঁ, গ্যাস-অম্বলের চাপে মাথাও নাকি ঘামে . . . কিন্তু আমরা কেন গ্যাস অম্বল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি বলুন তো? তার কারণ আছে। গৌতম ডাক্তার যতই বলে থাকুন না কেন, গ্যাস-অম্বল সম্পর্কিত কয়েকটা তথ্য কানে কানে যদি শোনানো যায়, আপনার মাথা শুধু ঘামবে না, ঘেমে-নেয়ে উঠবে, আপনি মাথা ঘুরে পড়বেন।

তথ্য ১: ২০১৩-২০১৪ অর্থনৈতিক বছরে আমেরিকার most prescribed drugs-এর তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে esomeprazole, একটি গ্যাসের ওষুধ। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে levothyroxine (এটি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কম ক্ষরণজনিত রোগে ব্যবহার করা হয়) এবং rosuvastatin (এটি রক্তে চর্বির পরিমাণ কমাতে ব্যবহৃত হয়)।

তথ্য ২: ওই একই বছরে আমেরিকার top selling drugs-এর তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে ওই ওষুধটি, esomeprazole। তালিকার প্রথম স্থানে aripiprazole, একটি মানসিক রোগের ওষুধ। তথ্যসূত্রটাও বলে দিচ্ছি, মিলিয়ে নিতে পারেন। IMS National Prescription Audit, IMS Health (আমেরিকার কথা শুনে ভুরু কোঁচকাবেন না, আমাদের দেশে এরকম কোনো সরকারি অডিটের সন্ধানই মেলেনি বলেই দেওয়া যায়নি।)

অর্থাৎ কিনা, ক্যান্সার নয়, এইডস নয়, টিবিও নয় . . . গ্যাস অম্বল; আমাদের সবার চেনা, আমাদের একান্ত আপন সেই গ্যাস অম্বল; সেই গ্যাস অম্বলের ওষুধ বিক্রি হয়েছে সবচেয়ে বেশি! পেটরোগা বাঙালির তো বটেই, লালমুখো আমেরিকানদের পেটও দেখুন গ্যাস-অম্বলে কীভাবে জর্জরিত!

আরও শুনুন। এই তথাকথিত গ্যাস-অম্বলের ওষুধের বেশির ভাগই পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে over the counter পাওয়া যায়, কোনো প্রেসক্রিপশন ছাড়াই। অর্থাৎ কম্পাউন্ডার হাতুড়ে তো বটেই আপনিও চাইলে ইচ্ছেমতো র‍্যান্টাক ওমেজ কিনে খেয়ে ফেলতে পারেন গ্যাস-গ্যাস 'ফিল' করলে।

আরও শুনবেন? গ্যাস অম্বলের তো আর একটামাত্র ওষুধ না। esomeprazole মাত্র একটা নাম। এরকম আরও খান পঁচিশ ওষুধ আছে, সিরাপ-টিরাপ সব মিলিয়ে। তার সঙ্গে আমাদের হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, পতঞ্জলি জুড়লে এই গ্যাস-অম্বলের বিজনেসখানা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পারছেন?

যাই হোক আমরা অম্বল নিয়ে আলোচনা করব বলেই শুরু করেছিলাম, সেই কথায় ফিরে আসি।

অম্বলের সমস্যাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. বুক জ্বালা বা heart burn —আসলে এটি acid reflux বা GERD-রই একটি উপসর্গ মাত্র)

২. Acid reflux (অ্যাসিড রিফ্লাক্স) এবং

৩. GERD (গ্যাস্ট্রো ইসোফ্যাজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ)

(বাংলায় এই ইংরেজি শব্দগুলোর উপযুক্ত প্রতিশব্দ নেই, এবং বাংলায় এই তিনটিকেই একই সঙ্গে অম্বলের রোগের মধ্যে ধরে নেওয়া হয়। এই তিনটি কিন্তু এক জিনিস নয়)

বুক জ্বালা বা Heart Burn

Heart মানে হৃদ্‌যন্ত্র বটে, কিন্তু Heart burn বা বুক জ্বালার সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডের কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক রয়েছে আমাদের গ্রাসনালী বা esophagus-এর। গ্রাসনালীর ভেতর দিকের আবরণী পাকস্থলীর মতো অত শক্তপোক্ত নয়, তাই তা অ্যাসিডকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য তেমন উপযুক্ত নয়। কোনো কারণে গ্রাসনালীর ভেতরের আবরণী পাকস্থলীর অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে বুক জ্বালার অনুভূতি হয়। সাধারণত খাওয়ার পর এই সমস্যা বেশি হয়। রাতে খাওয়ার পর শুয়ে পড়লেও এই সমস্যা বেশি হতে পারে।

Acid Reflux

Acid reflux বলতে বোঝায় পাকস্থলী থেকে বেরোনো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কিছু অংশ গ্রাসনালীতে উঠে আসা। আমাদের গ্রাসনালী ও পাকস্থলীর সংযোগস্থানে একটি পেশিবলয় (lower esophageal sphincter) থাকে; খাদ্য পাকস্থলীতে চলে যাওয়ার পর এই পেশিবলয় সংকুচিত হয়ে গিয়ে অ্যাসিড মিশ্রিত খাবারকে গ্রাসনালীতে ফিরে আসতে বাধা দেয়। কোনো কারণে এই পেশিবলয়টি সংকুচিত হতে না পারলে বা বলয়ের পেশিগুলি দুর্বল হলে অ্যাসিড মিশ্রিত খাবার সহজেই গ্রাসনালীতে উঠে চলে আসে। সমস্যা আরও বেড়ে যায় ফ্যাট বা তেল জাতীয় খাবার খেলে, বা অতিরিক্ত খাবার খেয়ে ফেললে, বা খাওয়ার পরে পরেই শুয়ে পড়লে। অ্যাসিড রিফ্লাক্স হলে বুক জ্বালার পাশাপাশি নীচের উপসর্গগুলোও দেখা যেতে পারে।

১. কাশি

২. গলা জ্বালা

৩. মুখে টক ভাব লাগা বা চোঁয়া ঢেকুরের সঙ্গে টক জল উঠে আসা।

GERD/GASTRO ESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

GERD কী?

GERD হচ্ছে অ্যাসিড রিফ্লাক্সেরই দীর্ঘস্থায়ী (chronic) রূপ। অ্যাসিড রিফ্লাক্সের উপসর্গগুলি দীর্ঘস্থায়ী হলে বা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে GERD হয়েছে বলে ধরা হয়।

কী হয় GERD-এ ?

এক্ষেত্রেও মূল সমস্যাটি অ্যাসিড রিফ্লাক্সের মতোই। অর্থাৎ পাকস্থলী থেকে বেরোনো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কিছু অংশ গ্রাসনালীতে উঠে আসে। তবে এক্ষেত্রে গ্রাসনালীর ভেতরের আবরণী অ্যাসিডের দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শে আসার কারণে আবরণীর কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং এই ঘটনা ক্রমাগত চলতে থাকলে কোষগুলির বৈশিষ্ট্যের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটতে পারে, যার ফলে গ্রাসনালীর ক্যান্সারও হতে পারে।

কী কারণে হয় GERD

যে সমস্ত কারণে অ্যাসিড রিফ্লাক্স হয় তার সবগুলিই GERD-র জন্য দায়ী। কারণগুলি হল:

১. গ্রাসনালীর নিম্নভাগের বৃত্তাকার পেশিবলয়ের (Lower Esophageal Sphincter) প্রসারিত হওয়া;

২. বৃত্তাকার পেশিবলয়ের দুর্বলতা;

৩. খাদ্যনালীর স্বাভাবিক চলন (Peristalsis) যদি না হয়;

৪. পাকস্থলী যেখানে অন্ত্রের সঙ্গে মেশে সেইখানে কোনো টিউমার বা বৃদ্ধি থাকলে খাবার এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা না পেয়ে গ্রাসনালীতে উঠে আসতে পারে;

৫. অতিরিক্ত ফ্যাট জাতীয় খাবার, পাকস্থলীর পক্ষে ক্ষয়কারী খাবার ইত্যাদি খাওয়া;

৬. বেশ কিছু ওষুধ খাওয়ার ফলে হতে পারে;

৭. এছাড়া মধ্যচ্ছদার হায়েটাস হার্নিয়া জাতীয় কিছু বিরল রোগে GERD হতে পারে।

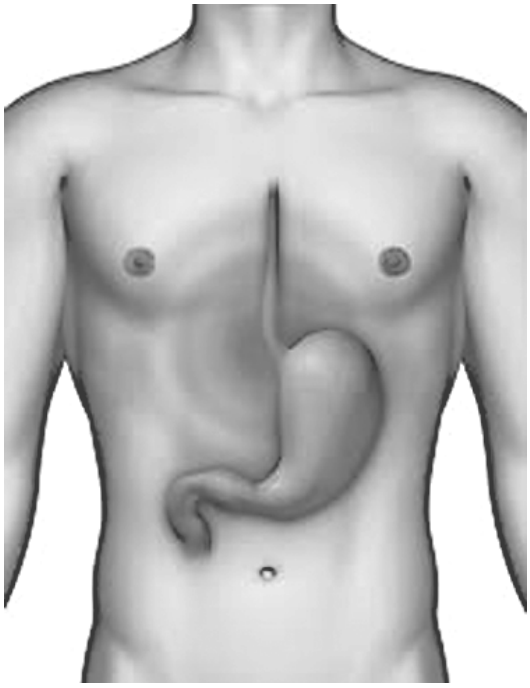

চিত্র ২. পাকস্থলী ও গ্রাসনালী

উপসর্গ

GERD-র সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গ হল বুক বা গলা জ্বালা এবং টক ঢেঁকুর বা জল উঠে আসা। অন্যান্য উপসর্গগুলি হল:

১. বুকে ব্যথা হওয়া—অনেক ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের ব্যথাকে এর থেকে আলাদা করা যায় না, তাই হঠাৎ করে শুরু হওয়া বুকের জ্বালা বা ব্যথা, বা চাপ ভাব লাগার উপসর্গ দেখা দিলে হার্টের সমস্যা কিনা খুঁজে দেখা আবশ্যিক। সব বুকের ব্যথাকে গ্যাসের ব্যথা বলে অবহেলা করলে কিন্তু সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

২. খাবার গিলতে অসুবিধা বা ব্যথা হওয়া।

৩. দীর্ঘস্থায়ী কাশি।

৪. কাশি বা বমির সঙ্গে রক্ত বেরোনো।

৫. দাঁতের ক্ষয়।

৬. ঘুমের সমস্যা হওয়া।

৭. মুখে দুর্গন্ধ হওয়া ইত্যাদি।

রোগ নির্ণয়

অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগের উপযুক্ত ইতিহাস, রোগের উপসর্গ থেকেই রোগ নির্ণয় সম্ভব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এন্ডোস্কোপি, ম্যানোমেট্রি ইত্যাদি পরীক্ষা করানোর দরকার পড়ে না। তবে খাবার গিলতে অসুবিধা, বা খাবার গিলতে গেলে ব্যথা, ওজন হঠাৎ করে কমতে থাকা, বমির সঙ্গে রক্ত ওঠা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিলে দেরি না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এন্ডোস্কোপি করানো উচিত।

চিকিৎসা

GERD-র চিকিৎসার মূলত দু-টি পদ্ধতি রয়েছে:

জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন

অম্বলজনিত যেকোনো রকমের সমস্যার ক্ষেত্রে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার বদলে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার সামান্য কিছু পরিবর্তন এনে সমস্যা যথেষ্ট কমানো সম্ভব। যেমন—

১. শরীরের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে ওজন কমানো। এতে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা কমে।

২. খাবারে ফ্যাট জাতীয় পদার্থের পরিমাণ কমানো।

৩. বেশি ঝাল, অ্যাসিড জাতীয় খাবার, টক খাবার না খাওয়া।
৪. ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে সেসব ত্যাগ করা।
৫. তামাক ও তামাকজাত নেশার জিনিস ব্যবহার না করা।
৬. খাওয়ার পরে পরেই শোয়ার অভ্যাস ছাড়া।
৭. যাদের রাতে খাওয়ার পর সমস্যা বেশি হয়, তাদের ক্ষেত্রে বিছানার মাথার দিকটা পায়ের দিকের চাইতে কিছুটা উঁচু করার ব্যবস্থা করলে সমস্যা কমতে পারে। বালিশ দিয়ে মাথা উঁচুতে করলে কিন্তু চলবে না, বিছানার মাথার দিকের পায়ার তলায় ইঁট দিয়ে উঁচু করে নেওয়া যেতে পারে।

ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা

GERD-র চিকিৎসায় মূলত তিন রকমের ওষুধ ব্যবহৃত হয়।

১. হিস্টামিন টাইপ ২ রিসেপ্টর ব্লকার—র‍্যানিটিডিন, ফ্যামোটিডিন ইত্যাদি।
২. প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর—ওমেপ্রাজোল, প্যান্টোপ্রাজোল ইত্যাদি।
৩. লিকুইড অ্যান্টাসিড—এতে ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালশিয়ামের লবণ থাকে যা ক্ষরিত অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে সাহায্য করে।

এর মধ্যে প্রথম দুই প্রকারের ওষুধ খাবার খাওয়ার আগে, ও শেষোক্ত ওষুধ খাবার খাওয়ার পরে খাওয়া উচিত। না হলে ফল পাওয়া যাবে না।

এছাড়া খাদ্যনালীর স্বাভাবিক চলনে ঘাটতি থাকলে ডমপেরিডন, মেটোক্লোপ্রামাইড জাতীয় প্রোকাইনেটিক ওষুধ (এগুলো খাদ্য নিয়ে যায় যেসব নালী তাদের সংকোচন প্রসারণ স্বাভাবিক করে) ব্যবহার করা যেতে পারে।

GERD-এ অপারেশন

ফান্ডোপ্লিকেশন অপারেশনের মাধ্যমে GERD চিকিৎসা করা গেলেও দেখা গেছে অপারেশন আর ওষুধ (এবং অবশ্যই খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন), দু-টির ফলাফলের ফারাক নগণ্য। বরং এতে অপারেশনের ঝুঁকির পাশাপাশি অপারেশন পরবর্তী অন্যান্য সমস্যা বাড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

GERD একটি রোগ, এবং আর পাঁচটা রোগের মতো এই রোগেরও উপযুক্ত চিকিৎসা জরুরি। কিন্তু একটু বুক-জ্বালা, পেট-জ্বালা, চোঁয়া ঢেকুর, গ্যাস, পেট ফুলে যাওয়া, গ্যাসজনিত ঘাড় বা কোমর ব্যথা ইত্যাদি মানেই কিন্তু GERD নয়। এগুলির অধিকাংশই অস্থায়ী, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যগ্রহণজনিত, বা অন্যান্য শারীরিক বা মানসিক কারণজনিত। এদের কোনো একটিই হলে তাকে GERD তকমা সেঁটে জীবনভর র‍্যান্ট্যাক ইত্যাদি গেলা বা গেলানো কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে রোগীও ধরেই বসে থাকেন তার গ্যাস-অম্বলের রোগই আছে, আর ডাক্তারও সময় নষ্ট না করে এসব বোঝানোর বদলে খচাখচ অ্যাসিড কমানোর ওষুধ লিখে দেন। আজকাল যেকোনো রোগীর যেকোনো রোগের প্রেসক্রিপশন দেখলেই অ্যাসিড কমানোর ওষুধ নজরে পড়বেই পড়বে। এসব ওষুধ দীর্ঘদিন অপ্রয়োজনে ব্যবহার করলে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে যেমন:

প্রথমে দেখুন আপনার সত্যিসত্যিই GERD হয়েছে কিনা। তারপর দেখুন ওষুধ ছাড়া যে চিকিৎসা করার থাকে সেটা আপনি পুরো করেছেন কিনা। তারপরেই কেবল ওষুধের দিকে হাত বাড়ান। নইলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

১. হাড়ের ভঙ্গুরতা বাড়ে, বা হাড় সহজে ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে।
২. খাবারের আয়রন, ভিটামিন বি$_{১২}$ শোষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে।
৩. মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া হতে পারে।
৪. ক্ষুদ্রান্ত্রের সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে।
৫. প্রোটিনজাত খাবারের পাচন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সুতরাং প্রথমে দেখুন আপনার সত্যিসত্যিই GERD হয়েছে কিনা। তারপর দেখুন ওষুধ ছাড়া যে চিকিৎসা করার থাকে সেটা আপনি পুরো করেছেন কিনা। তারপরেই কেবল ওষুধের দিকে হাত বাড়ান। নইলে হিতে বিপরীত হতে পারে। ডাক্তারবাবু চটপট ওষুধ দিয়ে দিলে একবারটি জিজ্ঞেস করুন, ঠিক কেন ও কতদিনের জন্য ওষুধ। বুঝে নিলে আখেরে আপনারই লাভ। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ডাক্তার।

Advt.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

নবজাতকের পরিচর্যা

মানবসমাজে নতুন শিশুর জন্ম পরিবারের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন তার মা বাবার পাশাপাশি বাকি সদস্যদের কাছেও নতুন দায়িত্ব নিয়ে আসে। নিকটাত্মীয় গুরুজন থেকে শুভাকাঙ্ক্ষী পাড়া প্রতিবেশী বাচ্চাকে মানুষ করার বিষয়ে নিজেকে অভিজ্ঞতাপ্রসূত নানা উপদেশ দেন। এর মধ্যে কিছু কিছু বেশ কার্যকরী, আবার কিছু কিছু বেশ ক্ষতিকর। আজকের আলোচনায় এই বিষয়েই আলোচনার চেষ্টা করেছেন— **ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে**।

এটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাচ্চার জন্ম সবসময় হাসপাতাল বা কোনো চিকিৎসাকেন্দ্রে হওয়া উচিত। যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাচ্চার জন্ম উচ্চতর হাসপাতালে হওয়া উচিত সে বিষয়ে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পূর্ববর্তী সংখ্যায় (২৭তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০১৬) আলোচনা করেছি। তবে বাচ্চার জন্ম যেখানেই হোক না কেন ছুটির সময় কিছু বিষয় আলাদা করে ডাক্তারবাবু বা কর্তব্যরত সিস্টারের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত। যেমন—

১. জন্মের সময় বাচ্চার ওজন কত হয়েছিল—পরিণত স্বাভাবিক বাচ্চার ওজন ২৫০০ গ্রামের বেশি অবশ্যই হওয়া উচিত। জন্মের সময় সঠিক ওজন জানা থাকলে পরবর্তী ক্ষেত্রে বাচ্চার পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সহজেই বোঝা যায়।

২. জন্মের সময় বাচ্চার Gestational Age বা গর্ভাবস্থার বয়স কত। ৩৭ সপ্তাহ থেকে ৪২ সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চাকেই পরিণত ও সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চা হিসাবে ধরা হয়।

৩. বাচ্চা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কেঁদেছিল কিনা। বাচ্চারা সাধারণত প্রথমবার কাঁদার সঙ্গেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সূচনা করে। কাঁদতে দেরি হলে বাচ্চাদের কিছু পদ্ধতিগত সাহায্যের প্রয়োজন হয় যাতে সে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া শুরু করতে পারে। কাজেই সেরকম কিছু দরকার হয়েছিল কিনা জেনে রাখা জরুরি।

৪. বাচ্চা প্রস্রাব বা পায়খানা করেছে কিনা। নবজাতক শিশু সাধারণত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পায়খানা ও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব করে থাকে। এর থেকে বেশি দেরি হলে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ও সঠিক কারণ জানতে চাওয়া উচিত।

৫. জন্মের সময় মাথার পরিধি কত হয়েছে তাও জেনে রাখা উচিত কারণ জন্মের পর প্রথম ২ বছর মাথার বৃদ্ধিই সবচেয়ে দ্রুত হয়। সেই বৃদ্ধির হার সঠিক হচ্ছে কিনা তা বোঝা যায় জন্মের সময় মাথার পরিধি থেকে। অবশ্য এই পরিমাপটা জন্মের পর পরই না করে জন্মের ঠিক ২৪ ঘণ্টা পরে করা উচিত।

৬. বাচ্চাকে জন্মের সময় ভিটামিন 'কে' ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে কিনা। এটা একটা অত্যাবশ্যক ওষুধ কিছু কিছু নিম্ন মানের বেসরকারি হাসপাতাল এখনও বে-খেয়ালে এই ইঞ্জেকশন দিতে ভুলে যায়।

৭. বাচ্চাকে জন্মের সময় থেকে ছুটির আগের মধ্যে '০' (জিরো ডোজ বা Birth Dose) টিকাকরণ (পোলিও/বিসিজি) দেওয়া হয়েছে কিনা।

এরপর বাচ্চাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলে দিনে দিনে উদয় হয় নানারকম সমস্যা। এই সমস্ত উদ্ভট সমস্যার বৈচিত্র্য এতই বেশি যে আমার মাত্র ৫ বছরের শিশু চিকিৎসার অভিজ্ঞতায় নিজেকে বেশ অসহায় মনে হয়। যাইহোক যে সমস্ত সমস্যাগুলো বেশি দেখেছি সেগুলো একে একে সমাধানের চেষ্টা করছি।

বাচ্চার স্নান

হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে গিয়েই বাচ্চাকে স্নান করানোর রীতি প্রায়শই দেখে থাকি। এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। বাচ্চার ত্বক পরিষ্কারই থাকে। ঋতুভেদে পরিবেশের তাপমাত্রা অনুযায়ী হালকা গরম জলে বাচ্চার গা মুছিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিছুদিন। সাধারণত নাড়ি শুকিয়ে পড়ে গেলে তারপর থেকে স্নান করানো যায়।

সরষের তেলের ব্যবহার একেবারেই কাম্য নয়। নাকে বা কানের ফুটোয় তেল ঢালা সম্পূর্ণ অনুচিত কাজ। আর চোখে কাজল লাগানো ক্ষতিকর।

সেক্ষেত্রেও পরিবেশ অনুযায়ী প্রতিদিন থেকে সপ্তাহে দু-একদিন সবই চলতে পারে। তবে অবশ্যই স্নান করিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই গা মুছিয়ে জামাকাপড় পরিয়ে দেওয়া উচিত। একমাত্র হালকা সুতির কাপড়ই ব্যবহার করা উচিত।

তেল সাবান পাউডার শ্যাম্পু

বাচ্চার মোটামুটি একমাস বয়েস হয়ে গেলে তেল মালিশ চলতে পারে। শিশুদের ত্বক এমনিই তৈলাক্ত হয়। নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল

জাতীয় হালকা তেলই এক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। সরষের তেলের ব্যবহার একেবারেই কাম্য নয়। নাকে বা কানের ফুটোয় তেল ঢালা সম্পূর্ণ অনুচিত কাজ। আর চোখে কাজল লাগানো ক্ষতিকর। শিশুর ত্বকের বাইরে অম্লধর্মী সুরক্ষা স্তর (Protection Acid Mantle layer) থাকে। সাবান

বিভিন্ন সুগন্ধি ট্যালকম পাউডারের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই।

দিলে সেই স্তর নষ্ট হয়ে ত্বক রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। তাই বড়োদের জন্য তৈরি সাবান শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে নিউট্রাল pH-এর সাবানগুলো বা ত্বকের উপযোগী সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট (Syndet) ব্যবহার করা যায়।

বিভিন্ন সুগন্ধি ট্যালকম পাউডারের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই।

শ্যাম্পুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এক মাস মতো বয়েসের পর বিশেষ ধরনের বেবি শ্যাম্পু সপ্তাহে দু-তিনবার ব্যবহার করতে পারেন। তবে ত্বকের মতো মাথাতেও যেহেতু অম্লধর্মী সুরক্ষাস্তর থাকে তাই খুব ঘনঘন বা বড়োদের জন্য তৈরি শ্যাম্পু ব্যবহার উচিত নয়।

বাচ্চার নাড়ি (Umbilical Cord)-র যত্ন

বাচ্চার নাড়ি সাধারণত ৬-১০ দিনের মধ্যে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার পর নাভিকে শুকনো রাখা উচিত। কোনো লোশন, তেল, কিছুই লাগাবার দরকার পড়ে না।

নাভি পড়ে যাওয়ার পর ওই জায়গায় অনেক সময় লাল রঙের ছোটো আকারের মাংসল পিণ্ড (umbilical granuloma) দেখা যায়। এক্ষেত্রেও ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সামান্য নুন বা ট্রিপল ডাই (Triple Dye) জাতীয় লোশন কিছুদিন ওই স্থানে লাগালে জায়গাটা শুকিয়ে যায়।

তবে নাভি যদি ২০ দিন পরেও না পড়ে বা নাভির থেকে পুঁজ বা রক্ত বের হয় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।

বাচ্চার চুল কামানো

বিশেষ করে মুসলিম সমাজে ৭ দিন বয়সে মাথা কামানো বহুল প্রচলিত। এতে বাচ্চার মেনিনজাইটিসের মতো জটিল রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই এক-দেড় বছর পর্যন্ত যতদিন না তালু শক্ত হচ্ছে চুল কমানো উচিত নয়।

শিশুর প্রস্রাব ও পায়খানা

নবজাত শিশু সাধারণত প্রথম ২-৪ দিন সারাদিনে ৩-৪ বার প্রস্রাব করে। কারণ এই সময়ে মায়ের দুধ গাঢ় হয় ও পরিমাণে কম থাকে। তবে তার পর থেকে সারাদিনে অন্তত ৬-৮ বার বা তার বেশিও প্রস্রাব করে।

প্রথম দিনের মধ্যেই অন্তত একবার পায়খানা করা উচিত এবং যা সাধারণত কালচে সবুজ চটচটে আঠালো প্রকৃতির হয়। তারপর ৭-১০ দিন ওই রকম কালচে সবুজ পাতলা পায়খানা চলতে থাকে। তারপর থেকে পায়খানার রং সোনালি হলুদ রঙের হয়—পাতলা বা সামান্য শক্ত হতে পারে—তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছানাকাটা প্রকৃতির সামান্য পাতলাই হয়। শিশু কতবার পায়খানা করবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রতিদিন ৫-৭ বার বা কখনো কখনো তার বেশি থেকে শুরু করে সপ্তাহে একবার—দুটোই স্বাভাবিক। বিশেষ করে খাওয়ানোর পর পরই সামান্য পায়খানা করাও স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (reflex) অঙ্গ।

বাচ্চা সবুজ পায়খানা করছে। পায়খানার রং সবুজ হওয়াটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো রোগই না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজে থেকেই কিছু দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়।

কোনো কোনো শিশু দেখা যায় প্রস্রাবের সময় জোরে কেঁদে ওঠে। এটাও খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আসলে মূত্রথলি ভরে গেলে তলপেটে সামান্য ব্যথা হয়। যেহেতু প্রস্রাব স্বেচ্ছায় করা সে শেখেনি তাই ওই ব্যথা অনুভব করে কী করা উচিত বুঝতে না পেরে সে কাঁদে। একটু পরে স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় (micturation reflex) প্রস্রাব হয়ে গেলে সে চুপ করে যায়। এরপর প্রস্রাব করে ভিজে গেলে আবার কাঁদে।

অনেক সময় আমরা অনেক চিন্তিত মায়েদের দেখা পাই—বাচ্চা সবুজ পায়খানা করছে। পায়খানার রং সবুজ হওয়াটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো রোগই না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজে থেকেই কিছু দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। তবে শুধু বুকের দুধ খাওয়া বাচ্চাদের অনেক সময় স্তন পান করানোর ভুল পদ্ধতির কারণেও সবুজ পায়খানা হয়। স্তন্যদুগ্ধের দুটি অংশ থাকে। প্রথমের দিকের জলীয় তরল অংশ (foremilk) ও শেষের দিকের অপেক্ষাকৃত গাঢ় পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ অংশ (hindmilk) বাচ্চাকে শুধুমাত্র তরল জলীয় foremilk খাওয়ালে অনেকসময় এরকম সবুজ পায়খানা হয়। সেক্ষেত্রে শিশুকে একটি স্তন সম্পূর্ণ খালি করে খাওয়ানো উচিত। এবং একটি স্তন পুরো খালি হলে তবেই দ্বিতীয় স্তনে মুখ লাগাতে দেওয়া উচিত।

৬ মাস বয়েস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত। জন্মের পর মিছরির জল, মধু, স্যালাইন জল কোনোটিই দেবেন না।।

মা ও শিশুর খাওয়া-দাওয়া

৬ মাস বয়েস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত। জন্মের পর মিছরির জল, মধু, স্যালাইন জল কোনোটিই দেবেন না। স্বাভাবিক প্রসবের পর ত্রিশ মিনিট ও সিজারিয়ান অপারেশন করে প্রসবের চার ঘণ্টার মধ্যেই মা শিশুকে স্তনদুধ পান করাতে সক্ষম হয়ে যান।

মায়ের খাওয়া-দাওয়ার কোনো বিশেষ বাছবিচার করার দরকার নেই। মা নিজের রুচি অনুযায়ী সমস্ত ধরনের খাবার খেতে পারেন। বরং এই সময় মায়ের অতিরিক্ত বেশি শক্তি অর্থাৎ বেশি ক্যালোরিসমৃদ্ধ (অতিরিক্ত

৫০০ কিলোক্যালারি) খাবারের দরকার পড়ে। অবশ্যই ক্ষতিকারক রাসায়নিক রং বা সংরক্ষক (Preservative) দেওয়া খাবার পরিহার করা উচিত।

তবে খাদ্য নিয়ে কতকগুলো প্রচলিত ভুল ধারণার ব্যাপারে কিছু কথা বলা দরকার। যেমন

১. মায়ের কোনো খাবারে অম্বল, গ্যাস, বদহজম হলে মায়ের দুধ থেকে শিশুরও অম্বল বদহজম হয় এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন।

২. সিজার হওয়ার পর মায়েদের ওপর নানা খাবারে বিধিনিষেধ—এরও কোনো বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা নেই।

৩. মায়ের বুকে দুধ নেই। সেজন্য বাজারজাত কোনো ভালো দুধ লিখে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে অনেকেই আসেন। প্রায় সবক্ষেত্রেই এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে মায়ের স্তনে দুধের পরিমাণ যথেষ্ট।

ক. কেবলমাত্র মায়ের দুধ খেয়ে বাচ্চা ২৪ ঘণ্টায় ৬ বার বা তার বেশি প্রস্রাব করছে।

খ. দুধ খাওয়ার পর অন্তত ২-৩ ঘণ্টা বাচ্চা শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

গ. বাচ্চার ওজন ঠিকমতো বাড়ছে। সাধারণত প্রতিদিন ২০-৩০ গ্রাম হারে ওজন বাড়ে।

ঘ. স্তন পান করানোর সময় মায়ের অন্য স্তন থেকে ফোঁটা ফোঁটা দুধ পড়ার ইতিহাস রয়েছে। পরবর্তী অংশ শেষ পৃষ্ঠায়।

এর পরেও যদি দেখা যায় যে 'অপর্যাপ্ত দুধ'-এর কারণে শিশুর পেট ভরছে না, পরবর্তী করণীয় কাজ হল কোনো ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে স্তন্যপানের সঠিক পদ্ধতি জেনে নেওয়া—অনেক সময়েই হয় যে ভুল পদ্ধতিতে শিশু বুকে ধরানোর কারণে বাচ্চা দুধ কম পাচ্ছে (wrong breast feeding technique), সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার যে সঠিক পদ্ধতিতে ঘন-ঘন বুকে ধরানো, এবং রাত্রিবেলায় বেশিবার বুকে ধরানো স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরণ বাড়ানোর প্রাকৃতিক উপায়; গুঁড়ো দুধ ধরানোটা এর সমাধান হতে পারে না।

৪. বাচ্চা খাওয়ার পরই বমি করছে। এটাও বেশির ভাগ শিশুর ক্ষেত্রেই খুব স্বাভাবিক ঘটনা। সামান্য ২-৩ চামচ দুধ তোলায় ক্ষতি কিছুই নেই। তবে খাওয়ানোর পর মায়ের বা অন্য কারও কাঁধের ওপর বাচ্চাকে এমনভাবে রাখতে হবে যে তার পেটে অল্প চাপ পড়ে ও তার ফলে বারবার ঢেকুর ওঠে। এতে অনেক সময়ই দুধ তোলার সমস্যার সুরাহা হয়।

৫. 'মায়ের সামান্য জ্বর, সর্দি কাশি হলেই বাচ্চার ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা বাড়ে তাই ওই সময় বুকের দুধ না দেওয়া উচিত'—এটিও আরেকটি ভিত্তিহীন ও ক্ষতিকর ধারণা।

৬. শিশুর ঘুম

নবজাত শিশুরা সাধারণত ১৬-১৭ ঘণ্টা ঘুমায়, তবে দিনের বেলা ঘুমানো আর রাত্রে জেগে থাকাটা স্বাভাবিক। আসলে বাচ্চা যখন মায়ের পেটে থাকে, তখন সারাদিন আরামে ঘুমায়। আবার রাত্রিবেলা মা যখন বিশ্রাম নেয় তখন সে জেগে থাকে। জন্মের পরও অভ্যেসটা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে তাই রাত্রে সে জেগে থাকে।

তবে মনে রাখতে হবে যে বাচ্চাকে সবসময় চিত করেই শোয়ানো উচিত; পাশ ফিরে বা উপুড় করে নয়।

এরপর কিছু কিছু সাধারণ সমস্যা যা প্রায়শই আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই সেগুলো নিয়ে দু-চার কথা বলি—

১. বাচ্চা খুব কাঁদছে।

বাচ্চার কাঁদার কারণ খুঁজে পাওয়া সময় বিশেষে সত্যিই বোঝা দায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে কিছু কিছু সাধারণ ব্যাপার ঘরেই করা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচ্চা এতে চুপ করে যায়। লক্ষ করলে দেখা যায় যে বাচ্চারা রাতেই বেশি কাঁদে, বিশেষ করে জীবনের প্রথম কয়েক মাস। এর কারণ:

—বাচ্চারা এই সময় রাত্রেই বেশি জেগে থাকে। একলা সে বিরক্ত বোধ করে।

— রাত্রে শারীরিক ক্লান্তির কারণে মায়েরা সময়মতো খাওয়ান না।

— আবার একই সময়ব্যাপী কান্না দিনের থেকে রাত্রে অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে।

বাচ্চা কাঁদলে একে একে নীচের পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে অনেক সময়ই তাকে চুপ করানো সম্ভব।

ক. প্রথমেই দেখা উচিত তার খিদে পেয়েছে কিনা। তাই বুকের দুধ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

খ. প্রস্রাব বা পায়খানা করে কাঁথা-কাপড় ভিজে থাকলে তা পালটে দেওয়া উচিত।

গ. এর পরও না থামলে তাকে কোলে নিয়ে ভুলানো উচিত যাতে তার মনোযোগ অন্যত্র আকর্ষিত হয়।

ঘ. কোনো পোকামাকড় কিছু কামড়েছে কিনা লক্ষ করা উচিত।

ঙ. অনেক সময় বিশেষ করে সন্ধ্যে বা রাত্রের দিকে এদের একটা

অজ্ঞাত কারণে পেটে ব্যথা জাতীয় কিছু হয়। শিশুকে খাইয়ে ঢেকুর ঠিকমতো তোলানোর পরেও যদি সমস্যাটি থেকে যায়, তখন সিমেথিকন (Simethicone) বা জাতীয় ওষুধগুলো কয়েকফোঁটা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দেওয়া যায়।

চ. খুব সামান্য চোট আঘাত বা অন্য কারণ জনিত ব্যথার থেকেও বাচ্চা অতিরিক্ত কাঁদে। সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামল ড্রপ জাতীয় ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়ানো যেতে পারে।

এর পরেও যদি কান্না না থামে তাহলে অবশ্যই হাসপাতাল বা অন্যত্র শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

২. জন্মের পর থেকেই বাচ্চার চোখে জল পড়ছে: আমাদের চোখে তৈরি জল সরু নালী বেয়ে চোখ থেকে নাক হয়ে গলায় চলে যায়। অনেক সময় জন্মগতভাবে নালীটি বন্ধ বা সরু থাকে। সেক্ষেত্রে নাকের পাটার দুপাশে নিয়মিত কিছুদিন হালকা মাসাজ করলেই নালীটি পুনরায় খুলে যায়। তবে মাসাজ করার পদ্ধতি অবশ্যই কোনো চিকিৎসকের কাছে শিখে নেওয়া উচিত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এক বছরে বয়সের মধ্যেই সমস্যা মিটে গেছে। তবে চোখ থেকে পিচুটি কাটলে বা চোখ লাল হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ লাগানো উচিত।

৩. বাচ্চা নিশ্বাস নিতে গেলে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে: এটাও খুব সাধারণ একটা ব্যাপার। সাধারণত ঘুমানোর সময় ব্যাপারটা ঘটে। আসলে আমাদের নাকের শ্লেষ্মা (Mucous) যখন ঘুমের সময় গলায় জমে আমরা অজান্তেই তা গিলে ফেলি। শিশুদের সেই ক্ষমতা পরিণত হয় না। ফলে গলায় জেমা হওয়া লালা ও শ্লেষ্মার মধ্য দিয়ে যখন নিশ্বাসের হাওয়া যাতায়াত করে তখন ঘড়ঘড় শব্দ হয়।

৪. বাচ্চার মাথায় চাপ খুশকির আস্তরণ হয়ে আছে: এটিও খুব সাধারণ ব্যাপার। সাধারণত প্রথম কয়েক মাসই এই সমস্যা থাকতে পারে। আসলে দুধের সঙ্গে মিশে থাকা মায়ের শরীরের কিছু হরমোন বাচ্চার মাথায় সিবাম (Sebum) গ্রন্থির তৈল ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, আর তার সঙ্গে পরিবেশের ময়লা জমে ওই বাদামি আস্তরণ হয়। স্নানের সময় বাচ্চাদের শ্যাম্পু দিয়ে সপ্তাহে দু-তিন বার করে মাসখানেক ধুলেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

৫. বাচ্চার পা বাঁকা: বাচ্চার পা বিশেষ করে হাঁটুর নীচ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত অংশ অনেক সময় সামান্য বাইরের দিকে বাঁকা থাকে। সাধারণত বছর খানেক বয়সের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে যায়। তবে পায়ের পাতা বাঁকা থাকাটা কিন্তু স্বাভাবিক নয়। সেক্ষেত্রে অস্থিরোগ-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

৬. জিভে সাদা আস্তরণ: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সাদা আস্তরণ দুধ জমে হয়। নবজাত শিশুদের লালাগ্রন্থির ক্ষরণ কম হয় বলে এইরকম দুধ জমে সাদা আস্তরণ হয়। তবে কখনো কখনো ছত্রাকের সংক্রমণ থেকেও এরকম হতে পারে। একটি ভেজা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে জিভের ওপর ঘষা উচিত। যদি দেখা যায় সাদা আস্তরণ সহজে উঠছে না বা রক্ত বেরোচ্ছে তাহলে তা ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে হচ্ছে বলে ধরা হয়।

৭. বাচ্চার গ্যাস অম্বল বদহজম: বুকের দুধে বদহজম কথাটা প্রায় সোনার পাথরবাটির মতোই বিরল ও প্রায় অবিশ্বাস্য। সুতরাং বুকের দুধ হজম করার জন্য এনজাইম ড্রপ ওষুধ খাওয়ানো নিতান্তই মূর্খতা।

৮. পুরুষাঙ্গের সামনের ছিদ্র খুব ছোটো: এক্ষেত্রেও দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু নেই। শতকরা ৯০ ভাগ বাচ্চার ক্ষেত্রে ৫ বছর বয়সের মধ্যে ছিদ্র স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে কখনো কখনো ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী স্টেরয়েড জাতীয় ক্রিম দিনে দু-বার করে ২-৩ মাস লাগানো যেতে পারে।

৯. বাচ্চার নাক বন্ধ হয়ে আছে: এক্ষেত্রে নিশ্বাস নেওয়ার সময় নাক থেকে শব্দ হয় ও দুধ খেতে সামান্য সমস্যা হয়। নাকের ড্রপ (Saline Nasal Drop) দুই নাকের ছিদ্রে কয়েকবার দিয়ে দিলেই এই সমস্যা থেকে সুরাহা হয়।

১০. স্ত্রী শিশুর জননেন্দ্রিয় থেকে রক্তপাত: এতেও ঘাবড়ানোর কিছু নেই। মায়ের শরীরের কিছু হরমোন শিশুর দেহে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটায়। সাধারণত জন্মের ৩-৪ দিনের মধ্যেই এটা দেখা যায়। নিজে থেকেই আবার বন্ধ হয়ে যায় ২-৩ দিনের মধ্যে। জায়গাটা পরিচ্ছন্ন রাখা ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসার দরকার পড়ে না।

১১. একই কারণে স্ত্রী বা পুরুষ দুই লিঙ্গের শিশুরই স্তন সামান্য ফুলতে পারে। এটাও কয়েকদিনের মধ্যেই নিজে থেকে ভালো হয়ে যায়।

১২. ন্যাপি র‍্যাশ বা ডায়াপার র‍্যাশ: একটাই ন্যাপি সারাদিন পড়িয়ে রাখলে ন্যাপি র‍্যাশ হওয়াটা খুব সাধারণ ঘটনা। ন্যাপি সাধারণত একটু ঢিলেঢালা বড়ো মাপের পরানো উচিত। সারাক্ষণ না পরিয়ে পালটানোর মাঝে কিছুক্ষণ শুকনো হাওয়া-বাতাস লাগতে দেওয়া ভালো। জিঙ্ক অক্সাইড বা পেট্রোলিয়াম জেলি জাতীয় মলম লাগিয়ে তারপর ন্যাপি পরালে র‍্যাশ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে।

১৩. ওষুধ-বিষুধ: সমস্ত শিশুকেই ১ বছর বয়স পর্যন্ত ভিটামিন 'ডি' (400 IU) প্রতিদিন খাওয়ানো উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর সঙ্গে আয়রন ড্রপও ১ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

১৪. টিকাকরণ: জন্মের পর বি.সি.জি. টিকার পর সেখানে সামান্য ঘা হওয়া বা বগলে গুটলি মতো ফুলে যাওয়া হতে পারে।

আবার ৬ সপ্তাহ বয়সে DTP টিকার পর সামান্য জ্বর আসাটাও স্বাভাবিক। সামান্য প্যারাসিটামল ড্রপ-ই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। তবে যাই হোক সময়মতো সমস্ত টিকা নেওয়াটা অবশ্য কর্তব্য।

১৫. সিজারে বাচ্চা হলে সে দুর্বল হয়। তার অসুস্থতার প্রবণতা বাড়ে এবং মায়ের দুধ নামে না: ''সিজার হলে মায়ের জন্য নানারকম বিধিনিষেধ যাতে মায়ের নাড়ি পেকে না যায়''—ম ায়ের নাড়ি যে ঠিক কী বস্তু তা আমার জানা নেই। বলাই বাহুল্য এই প্রত্যেকটি ধারণা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন।

মোটামুটিভাবে সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চার বাড়ির পরিচর্যা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তবে এর বাইরেও আরও অনেক কিছু আলোচনার পরিসরের বাইরে রয়ে গেল। তাই নিজের বাচ্চা অসুস্থ মনে হলে সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নেবেন। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. সব্যসাচী পাণ্ডে, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালে শিশুরোগ বিভাগের চিকিৎসক।

ডায়াবেটিস ও চোখ

(একটি কল্পিত ইন্টারভিউ)

ডা. সোহম সরকার

প্র: ডাক্তারবাবু আপনি বলছেন ডায়াবেটিসের সঙ্গে চোখের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে?

উ: অবশ্যই। ডায়াবেটিস যদি ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো চোখেও কিছু অসুখ বাসা বাঁধে।

প্র: কীভাবে এটা হয় একটু বুঝিয়ে বলবেন?

উ: ডায়াবেটিসে রোগে শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহী নালীতে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন আসতে শুরু করে। রক্ত ও তার উপাদানগুলি শিরা-ধমনির দেওয়াল ভেদ করে বাইরে আসতে থাকে এবং আরও কিছু জটিল পরিবর্তন হয়। এইসবকে বলে মাইক্রোঅ্যাঞ্জিয়োপ্যাথি (Microangiopathy)। পরে নতুন কিছু অস্বাভাবিক রক্তনালীও তৈরি হয় (Neoangiogenesis)। এই নতুন রক্তনালী বা অন্য রক্তনালী ফেটে গিয়ে তাদের আশেপাশে রক্ত জমা হতে পারে।

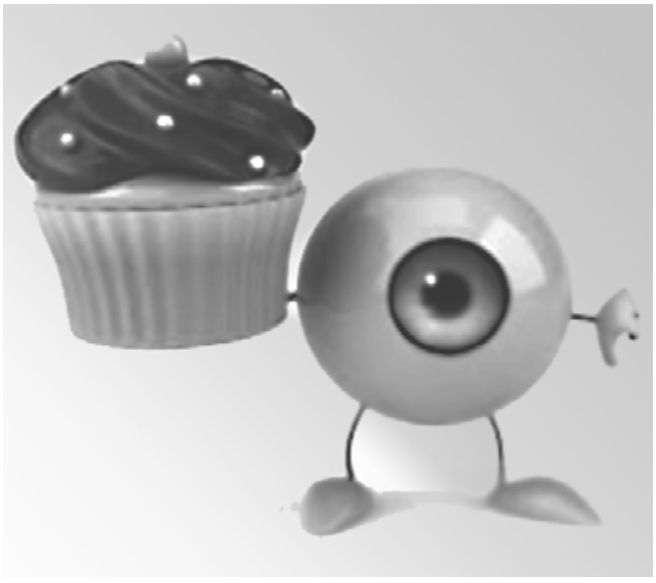

চিত্র ১. ডায়াবেটিস? চোখ বাঁচাতে সতর্ক হোন

প্র: চোখের ভিতরেও এমন রক্তপাত হয় নাকি? দৃষ্টিশক্তির তো সাংঘাতিক ক্ষতি হবে!

উ: শেষের দিকে তাই হয়। প্রথমদিকে অবশ্য এরকম হয় না—বস্তুত প্রথমদিকে দৃষ্টিশক্তির কোনো ক্ষতিই হয় না। রোগী কিছু টের পান না। চিকিৎসা না হলে এমনকী শেষে সম্পূর্ণ অন্ধত্বও অসম্ভব নয়।

প্র: ব্যাপারটা তাহলে ধারাবাহিক? কতদিন সময় লাগে? রক্তে সুগার লেভেলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে?

উ: ঠিক তাই। ডায়াবেটিসে চোখে প্রধান যে সমস্যাটি হয় তাকে বলে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি (Diabetic Retinopathy)। এর বিভিন্ন পর্যায়গুলো এরকম—

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি (Diabetic Retinopathy বা DR)

১. নতুন রক্তনালী তৈরির আগের পর্যায় (Non-proliferative DR) প্রাথমিক পর্যায়।

এর উপপর্যায়গুলো হল—

ক. অল্প (Mild)।

খ. মাঝামাঝি (Moderate)।

গ. বাড়াবাড়ি (Severe)।

ঘ. খুব বাড়াবাড়ি (Very severe)।

২. নতুন রক্তনালী তৈরির পর্যায় (Proliferative DR)

যখন চোখের ভিতর এক বা অনেক নতুন অস্বাভাবিক রক্তনালী তৈরি হয়ে গেছে। এর উপপর্যায়গুলো হল—

ক. প্রাথমিক (early)।

খ. উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন (High Risk)।

এছাড়া রেটিনার সবথেকে সংবেদনশীল অংশ, যাকে বলে ম্যাকুলা, সেখানে জলীয় পদার্থ (fluid) জমা হয়েছে কি হয়নি (clinically significant Macular Edema CAME)—তাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ডায়াবেটিস রোগীর চোখের এইসব ক্ষতি কবে হতে পারে, সেই সময়ের ব্যাপারটা নির্ভর করছে ডায়াবেটিস কত ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তার ওপর। তবে মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ হলেও দেখা গেছে ২০ বছর ডায়াবেটিসে ভোগার পর শতকরা ৪০ ভাগ লোকের মধ্যে কিছু পরিবর্তন থাকেই। সুগার লেভেল খুব হাই থাকলে সব চেঞ্জই খুব তাড়াতাড়ি হয়।

ডায়াবেটিস রোগীর চোখের এইসব ক্ষতি কবে হতে পারে, সেই সময়ের ব্যাপারটা নির্ভর করছে ডায়াবেটিস কত ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তার ওপর। মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ হলেও দেখা গেছে ২০ বছর ডায়াবেটিসে ভোগার পর শতকরা ৪০ ভাগ লোকের মধ্যে কিছু পরিবর্তন থাকেই।

প্র: নারী না পুরুষ, জাতি বা দেশ, ডায়াবেটিস-এর টাইপ—এসবের ওপর চোখের ক্ষতি কিছুই কি নির্ভর করে না?

উ: খুব একটা না—তবে ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট টাইপে ক্ষতির সম্ভাবনা কিছুটা হলেও বেশি।

প্র: ডায়াবেটিস রোগীদের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ছাড়া চোখে আর কী কী হয়?

উ: ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির দ্বিতীয় পর্যায়, যে পর্যায়ে নতুন অস্বাভাবিক রক্তনালী চোখের ভেতর তৈরি হয় তখন দু-টি মারাত্মক জটিলতা হল ভিট্রেয়াসে রক্তপাত এবং তার ফলে ট্র্যাকশনাল রেটিনাল ডিটাচমেন্ট (Tractiond Retinal Detachment) আর নিওভাসকুলার গ্লকোমা (Neovascular Glaucoma)---- এগুলোই সম্পূর্ণ অন্ধত্বের জন্য দায়ী।

চিত্র ২. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে চোখের বিপদ

রেটিনোপ্যাথি ছাড়া ডায়াবেটিসে আর যা যা হয় তা হল—চোখের 'পাওয়ার' বাড়া-কমা। খুব কম সময়ের মধ্যে এই কমা বাড়া হয়, তাই রক্তের শর্করা মাত্রা (sugar level) স্থিতিশীল হলে তবে চশমার পাওয়ার দেওয়া উচিত। এছাড়া ডায়াবেটিক ছানি (snow flake cataract) হতে পারে।

প্র: হ্যাঁ ডাক্তারবাবু সমস্যাটা বোঝা গেল, এবার পরিত্রাণের উপায় বলুন।

উ: ছানি পড়লে অন্য সাধারণ ছানির মতোই ছানি অপারেশন করে ইন্ট্রা-অকুলার লেন্স (IOL) বসাতে হয়। অবশ্য সুগার ভালোভাবে কন্ট্রোল করে এবং যদি রেটিনার অবস্থা স্থিতিশীল থাকে, ম্যাকুলাতে জলীয় পদার্থ জমা (maculor edema) না থাকে তবেই এই অপারেশন করা যায়। ইন্ট্রা-অকুলার লেন্সও এক্ষেত্রে কেবলমাত্র ডাক্তারের পরামর্শমতো বসাতে হয়।

প্র: আর রেটিনোপ্যাথি হলে কী করব?

উ: পর্যায় (stage) অনুযায়ী একদম প্রাথমিক অবস্থায় শুধু নজরদারি এবং রেগুলার চেক আপ। রক্তে শর্করা বা গ্লুকোজ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ ভালো থাকলে বছরে একবারই চোখের ডাক্তারের চেক-আপ যথেষ্ট। পরবর্তীতে ইঞ্জেকশান, লেসার, এবং অপারেশন দরকার হয়।

ইঞ্জেকশন মানে অ্যান্টি-ভিইজিএফ (Anti- VEGF), লেসার মানে প্যান-রেটিনাল ফোটোকোয়াগুলেশন (Panretinal Photo-coagulation—PRP) এবং অপারেশন মানে ভিট্রেয়াস বাদ দেওয়া (Vitrectomy —যদি ভিট্রেয়াস-এ রক্তপাত হয়ে থাকে) এবং ডিটাচমেন্ট সার্জারি (Retinal Data-chment Surgery)।

প্র: খরচ?

উ: যে ইঞ্জেকশনটা দেবার কথা বইতে লেখা আছে সেটার দাম কুড়ি হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকা। আর কম খরচের একটা ইঞ্জেকশন আছে যদিও সেটা আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত নয়, তার দাম পাঁচ-ছয় হাজার।

লেসার প্রতি সিটিং-এ ১৫০০-৩০০০ টাকা।

অপারেশন খরচ সাধারণত ১৫০০০ থেকে ৪০০০০ টাকা। অনেক সময় একাধিক ইঞ্জেকশন নিতে হয়।

তবে সবই বিফলে যাবে যদি ডায়াবেটিস ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করা না হয়। সচেতনতার জন্য কোনো পয়সা দিতে হয় না। সেটা অ-মূল্য বলেই অনেকে সেটাকে ফালতু ভাবেন! **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. সোহম সরকার, এমবিবিএস, এমএস, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

বুক ধড়ফড়

ডাক্তারের কাছে সব থেকে বেশি যে সমস্যাগুলো নিয়ে রোগীরা আসেন, তার মধ্যে ''বুক ধড়ফড়'' করার সমস্যাটা অন্যতম। এই অনুভুতিটা যে সবার মুখের ভাষায় একরকম তাও নয়, কারোর মনে হয় বুকের ভিতর কিছু লাফাচ্ছে, কারোর বা থেকে থেকে বুকের ভিতর থেকে কেউ ধাক্কা মারছে—এরকম নানা অনুভূতির ভিতরের রহস্য জানাচ্ছেন **ডা. কুশল সেন**।

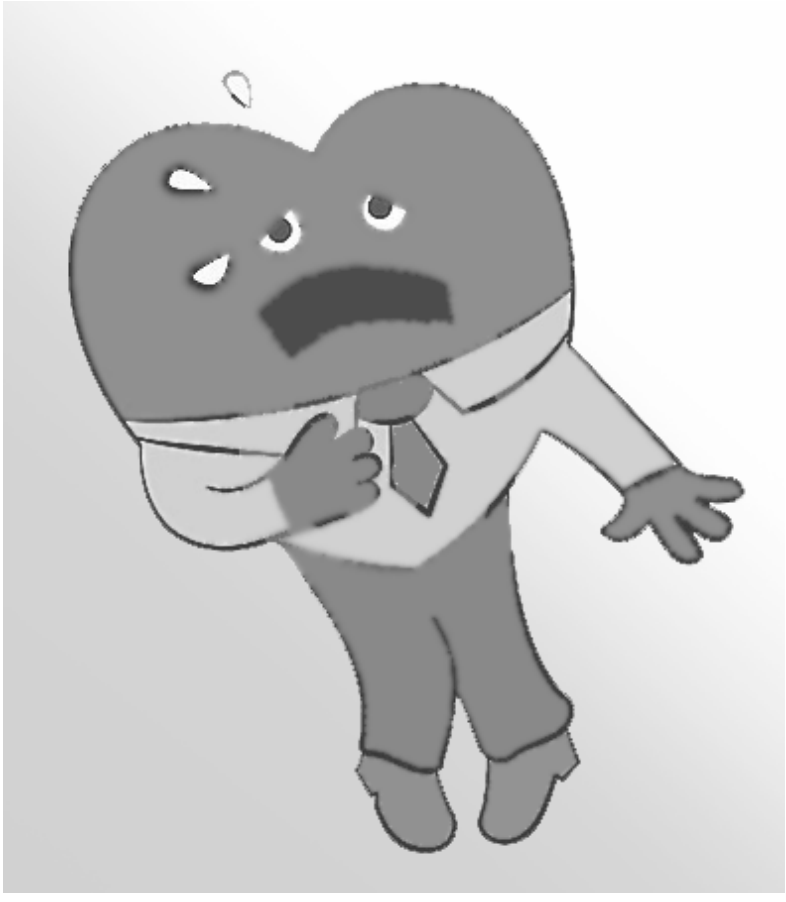

হৃদ্‌যন্ত্র তার নিয়মিত ও স্বাভাবিক গতিতে সবসময় কাজ করে চলছে, মানুষ টেরই পায় না সেকথা। কিন্তু নিজের হৃদ্‌যন্ত্রের অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক গতি, যা হৃদ্‌যন্ত্রের উপস্থিতি ও কাজকে টের পাইয়ে ছাড়ে, সেটাকেই বুক ধড়ফড় বলা হয়। কিন্তু বহু রোগী বুকের ভিতরকার অস্বস্তিভাব, ভারী কাজ করার পর হাঁপিয়ে পড়া, কিংবা কখনো কখনো বুকের ভিতের হালকা চিনচিনে ব্যথাকেও বুক ধড়ফড় রূপে ব্যক্ত করে থাকেন। তাই বুক ধড়ফড়কে সামান্য উপসর্গ হিসাবে না দেখে তার উপযুক্ত চিকিৎসা করানো বাঞ্ছনীয়। বুক ধড়ফড় করার কারণগুলো সম্বন্ধে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

বুক ধড়ফড় করার কারণ-গুলো হল হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ (৪৩ শতাংশ ক্ষেত্রে), মানসিক সমস্যা ও ব্যাধি যেমন: দুশ্চিন্তা, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি (৩১ শতাংশ ক্ষেত্রে), বিবিধ (১০ শতাংশ)। বাকি ১৬ শতাংশ ক্ষেত্রে বুক ধড়ফড়ের কারণ অজানাই থাকে।

হৃদ্‌যন্ত্রের যে রোগে সাধারণত বুক ধড়ফড় হয় তাদের মধ্যে অ্যারিদ্‌মিয়া বা হৃদ্‌যন্ত্রের গতির অনিয়মিত হওয়া কিংবা তার ছন্দপতন একটা কারণ। হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে থাকে চারটে কুঠুরি—দুটো অলিন্দ ও দুটো নিলয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এরা পর্যায়ক্রমে সংকুচিত-প্রসারিত হয়, আর সেটা আমরা টের না পেলেও তার ফলেই আমাদের দেহে রক্ত চলাচল করতে পারে। যখন এদের ছন্দ বিগড়ে যায়, অর্থাৎ অলিন্দের অনিয়মিত সংকোচন কিংবা নিলয়ের অনিয়মিত সংকোচন হয়, বা এ-দুয়ের চলার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, তখন বুক ধড়ফড় করে। আবার অলিন্দ ও নিলয় নিজেদের ছন্দের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নিয়মিত চললেও যদি বেশি আস্তে বা বেশি দ্রুততালে সংকোচন-প্রসারণ করতে থাকে তখনও বুক ধড়ফড় করতে পারে। আমরা সবাই জানি অ্যারোবিক ব্যায়াম, যেমন দৌড় বা লাফঝাঁপ করলে বুক ধড়ফড় করাটাই স্বাভাবিক। হৃদ্‌যন্ত্রের গতি স্বাভাবিকের থেকে কম (মিনিটে ৬০ বারের কম) অথবা বেশি (মিনিটে ১০০ বারের বেশি) হলেও বুক ধড়ফড় করতে পারে। তবে ব্যায়াম বা বেশি উত্তেজনা ছাড়াও এমনি এমনি বুক ধড়ফড় কোনো রোগের লক্ষণও হতে পারে।

আমাদের অলিন্দ ও নিলয় একে অপরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়, সেটা হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতরে এক ধরনের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কখনো কখনো এই

হৃদ্‌যন্ত্রের গঠনগত রোগ ছাড়া বা প্রাণহানিকর কয়েক ধরনের হৃদছন্দপতন বা অ্যারিদ্‌মিয়া ছাড়া অধিকাংশ বুক ধড়ফড়ের কারণই খুব একটা চিন্তার কিছু নয়। তবে ক্রমাগত বুক ধড়ফড় হতে থাকলে তাকে অবহেলা না করে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের ব্যাঘাত ঘটলে অলিন্দ ও নিলয়ের নিজেদের ছন্দের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন এই চারটে কুঠুরি যে যার মতো সংকুচিত

ও প্রসারিত হতে থাকে, সে ক্ষেত্রেও কখনো কখনো বুক ধড়ফড় করতে পারে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে বেশির ভাগ ছন্দের সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়াতে (হৃদ্‌ছন্দপতন, ডাক্তারি পরিভাষায় অ্যারিদ্‌মিয়া) কিন্তু বুক ধড়ফড় হয় না। এছাড়াও হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতরকার প্রকোষ্ঠের মধ্যেকার কপাটিকার রোগ (মাইট্রাল ভালভ প্রোল্যাপ্‌স্‌, অ্যাওরটিক ইন্‌সাফিসিয়েন্সি), হৃদ্‌যন্ত্রের টিউমার (অ্যাট্রিয়াল মিক্সোমা), ফুসফুসীয় ধমনিতে অ্যাম্বোলিসম বুক ধড়ফড় করার অন্যতম গুরুতর কারণ।

মানসিক ব্যাধিগুলোর মধ্যে মানসিক অবসাদ, অত্যধিক দুশ্চিন্তা, প্যানিক ডিসঅর্ডার এদের যেকোনো একটি বা তার বেশি কারণে বুক ধড়ফড় করার সমস্যা নিয়ে প্রকাশ পায়। সাধারণত মানসিক ব্যাধির কারণে যে বুক ধড়ফড় তা দীর্ঘস্থায়ী হয় (১৫ মিনিটের বেশি)।

যে যে কারণে শরীরের রক্তচলাচলের গতি বেড়ে যায় যেমন: পরিশ্রমের বা ব্যায়ামের পর, মানসিক চাপ বাড়লে, শরীরের রক্তাল্পতা থাকলে, সন্তানসম্ভবা মায়েদের, ফিয়োক্রোমোসাইটোমা নামক স্নায়ু-অন্তক্ষরা গ্রন্থির (neuro-endocrine) টিউমার, থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ যাতে থাইরয়েড হরমোন অধিক ক্ষরিত হয়, সে সব কারণে হৃদ্‌স্পন্দনের গতি বেড়ে যায় ও বুক ধড়ফড় করে। এছাড়া কিছু ওষুধ বা নেশার জিনিস, যা হৃদ্‌পেশির সংকোচন ক্ষমতা বাড়ায় বা দ্রুতলয়ে সংকোচন-প্রসারণ করায়, সেগুলো ব্যবহারের ফলেও বুক ধড়ফড় হতে পারে—যেমন: তামাক, ক্যাফেইন, অ্যামিনোফাইলিন, থাইরক্সিন, অ্যাট্রোপিন, কোকেইন, এম্ফিটামিন, স্যালবুটামল ইত্যাদির ব্যবহার।

এটা মাথায় রাখতে হবে হৃদ্‌যন্ত্রের গঠনগত রোগ ছাড়া বা প্রাণহানিকর কয়েক ধরনের হৃদছন্দপতন বা অ্যারিদ্‌-মিয়া ছাড়া অধিকাংশ বুক ধড়ফড়ের কারণই খুব একটা চিন্তার কিছু নয়। তবে ক্রমাগত বুক ধড়ফড় হতে থাকলে তাকে অবহেলা না করে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। যদি কারও আগে থাকতে হৃদ্‌যন্ত্রে রক্তচলাচলের দোষ বা ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ থেকে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তিকে বেশি সতর্ক থাকতে হবে। প্রাথমিকভাবে ইসিজি করে অ্যারিদ্‌মিয়া আছে কিনা বোঝা যায়। যদি ইসিজি দেখে খারাপ কিছু ডাক্তারবাবু সন্দেহ করে থাকেন তাহলে কারণ ঠিক করে ধরার জন্য ইকোকার্ডিওগ্রাফি বা হল্টার মনিটর করানো যেতে পারে।

আলাদা করে বুকধড়ফড়-এর কোনো ওষুধ নেই, বুক ধড়ফড়ের সঠিক কারণ নির্দিষ্ট করা গেলে তার চিকিৎসা শুরু করলেই বুক ধড়ফড়ের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. কুশল সেন, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি এক ক্লিনিকের আংশিক সময়ের চিকিৎসক।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

সীমান্ত জীবন

(পর্ব ২)

ডা. মৃন্ময়

গেছি সীমান্তরক্ষীদের নির্যাতনের শিকার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আয়োজিত ডাক্তারি ক্যাম্পে। অনেকক্ষণ বসে হাত-পা-কোমরে টান ধরেছে তাই একটু ঘরের বাইরে বেরিয়ে চায়ে চুমুক দিয়েছি। এমন সময় অনেক রোগী-রোগিণীর মধ্যে দেখি কোলে তিন বছরের ছেলে নিয়ে এক বছর-বিশেকের মেয়ে বসে। সে ওই পরিবেশেও ছেলেকে গল্প শোনাতে ও হাতে উলের টুপি বুনতে ব্যস্ত। এতজনের মাঝে মেয়েটিকে আমার নজরে পড়ার কারণ মূলত দু-টি। প্রথমত মেয়েটিকে দেখলেই বোঝা যায় উদ্যমী, আর দ্বিতীয়ত এত কম বয়সে কীভাবে মেয়েটি নির্যাতনের শিকার হল? তাই মেয়েটির ডাক্তার দেখানো শেষ হতে তাকে ডাকলাম।

-আচ্ছা তোমার কি বাড়ি ফেরার তাড়া আছে? না হলে একটু কথা বলতাম তোমার সঙ্গে।

- না না . . . বলুন না। তাড়া নেই।

ডাক্তারি পেশার এ এক বিশাল সুবিধে। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সহজে গল্প করা যায়। আমি কাগজ-কলম সাজাতে ব্যস্ত। মেয়েটি আমায় জিজ্ঞেস করল:

- বসব চেয়ারে?

- আরে হ্যাঁ। এটা আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে। বসো বসো।

কোলের ছেলেকে সামলে নিয়ে বসল মেয়েটি।

- তোমার নাম?

- রহিমা বিবি (নাম পরিবর্তিত)

- আচ্ছা তোমার ওপর ওরা কি নির্যাতন করেছিল?

- না না . . .। আমার ওপর সরাসরি ওরা কোনো নির্যাতন করেনি। তবে . . . (মুখ নিচু করে চুপ হয়ে গেল রহিমা)।

- তাহলে বাবা-মা বা শ্বশুর-শাশুড়ি . . .?

রহিমা চুপ হয়ে থাকে। আমিও বুঝতে পারি না ঠিক কী বলব। কথা বদলানোর জন্য ছেলেটির দিকে তাকিয়ে গাল টিপে বললাম . . .

- পিট্‌পিট্ করে তাকাচ্ছিস যে। তোমার ছেলেটি কিন্তু বেশ মিষ্টি।

- আসলে কী বলুন তো। আপনাকে দেখতে অনেকটা ওর আব্বার মতো। তাই ও আপনার দিকে ওরকম তাকিয়ে আছে।

- ওর বাবা আসেনি?

- (মুখ নিচু করে) . . . আসবে কী করে। ওর বাবা আর নেই। মেরে ফেলেছে ওরা।

ঘর জুড়ে নানা কিসিমের নানা চেঁচামেচির মাঝে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। কিছুক্ষণ পর আমি জিজ্ঞেস করলাম:

- তোমার বয়স তো বেশি না।

- ২৩ (চোখ মুছে রহিমার উত্তর)

- আর ছেলের বয়স?

- সাড়ে তিন বছর

- ও . . .। তাহলে নিশ্চয়ই ১৮ বছরে তোমার বিয়ে হয়েছিল?

- না না . . . ১৭ বছরে। তখন আমি ১২ ক্লাসে পড়ছিলাম। পরীক্ষার দেড় মাস আগে বিয়ে হয়।

- তারপর কতদূর পড়াশোনা করেছ?

- অনেক ঝামেলা করে ১২ ক্লাসের পরীক্ষা পাশ করেছিলাম। তারপর আর পড়তে দেয়নি। ১২ ক্লাসের পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে বাড়িতে সে কী ঝামেলা!

- তোমাকে যে পড়তে দিল না তা তুমি কিছু বললে না?

- আরে বলাতেই তো আরও বেশি ঝামেলা। আসলে কী বলুন তো? মেয়েমানুষ পড়ে আবার কী করবে? রান্নাবান্না, বাচ্চা মানুষ করা আর সংসারে কাজ করার জন্য আবার পড়ার দরকার নাকি! এটাই ভাবে সবাই।

আমি মনে মনে ভাবি। তথাকথিত শিক্ষিত ও রাজনৈতিক পরিবারে পুঁথিগত শিক্ষার মানের সীমারেখা টানা না থাকলেও বাড়ির কাজ ও বাইরের কাজ, এর সীমা ভালো করেই ভাগ করা আছে, আর তাতে লিঙ্গভেদ অস্থিমজ্জাগত।

- আচ্ছা তোমার স্বামী মারা গেলেন কীভাবে?

> কয়েকজনকে তো সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও পুলিশি ঝামেলায় ডাক্তার দেখতেই পারেনি। বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে।

- তা প্রায় ১ বছর হয়ে গেল। আমার ছেলেকে একদিন সাপে কামড়েছিল। আমার বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ির পাশের গ্রামে। আর কবিরাজের বাড়ি বাপের বাড়ির কাছে। তাই আমার বাড়ির মানুষ ছেলেকে কবিরাজ-এর কাছে দেখিয়ে আমাকে আর ছেলেকে বাপের বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসে। দু-দিন পরে ভোর চারটেয় একজন এসে খবর দেয় যে মেহতাজের আব্বাকে জওয়ানরা গুলি মেরেছে। তারপর ওনাকে বসিরহাটে একটা নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে কলকাতায় রেফার করে দেয়। তখন কলকাতায়

তালতলাতে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। দু-দিন পর মারা যায়। (মেহতাজ হল ওই বাচ্চা ছেলেটির নাম)।

- কত খরচ হয়েছিল?

- প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার মতো।

- তোমরা সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে না কেন?

- সরকারি হাসপাতালে জওয়ানরা গুলি মারলে ভর্তি নিতে চায় না। কেসের ভয় দেখায়। নানা রকম আইনের জটিলতা নিয়ে ঝামেলা করে। আমাদের গ্রামের অনেকের ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে। কয়েকজনকে তো সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও পুলিশি ঝামেলায় ডাক্তার দেখতেই পারেনি। বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে।

- ছেলেকে যখন সাপে কামড়েছিল হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে কবিরাজের কাছে নিয়ে গেলে কেন?

আমার শ্বশুর, শাশুড়ি আর ছোটো বউ খুব ভালো। কিন্তু দেওরটা ঢ্যামনা। মেহতাজের আব্বু মারা যাওয়ার পর আমায় নানা নোংরা প্রস্তাব দেয়। যখন-তখন ফোন, সামনাসামনি নানাভাবে জ্বালায়। নানা সময় শারীরিক নির্যাতন করার চেষ্টা করেছে।

- আমি তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকেদের মাঝে আমার কথা টেকেনি। সংসারে মেয়েদের কথার কোনো দাম থাকে নাকি ডাক্তারবাবু! . . . ছোটোবেলা থেকে বাড়িতে শিখিয়েছে—মেয়েরা হল জলের মতো, যে পাত্রে রাখবে তারই আকার নেবে। যতই শিক্ষা থাকুক না কেন সংসারে গিয়ে মূর্খ।

- তোমার স্বামী কী কাজ করত?

- আমার যখন বিয়ে হয় তখন উনি এলাচ, কিসমিস, শুকনো দুধ পাচার করতেন। জওয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। হঠাৎ করে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ৩ মাস কোনো কাজ নেই। শেষে মারা যাওয়ার ১ সপ্তাহ আগে গোরু পাচার-এর কাজ শুরু করে।

- জওয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকতেও মারল কেন?

- জওয়ানরা গোরু পিছু ২০০০ টাকা করে ঘুষ নেয়। ওই দিন ওরা ৩টে গোরু পৌঁছে দিয়ে ফিরছিল। তখন অন্য এক জওয়ান এসে দ্বিতীয়বার টাকা চায়। না পেয়ে ছররা মারে, গুলি চালায়।

- তোমার শ্বশুরবাড়িতে কে কে থাকে?

- শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ছোটো বউ, ছেলে, আমি। ভাশুর আর বড়ো বউ বম্বেতে (মুম্বাই) থাকে।

- শ্বশুরবাড়ির লোকজন ভালো? মানে ঝামেলা-ঝগড়া করে না তো?

- আমার শ্বশুর, শাশুড়ি আর ছোটো বউ খুব ভালো। কিন্তু দেওরটা ঢ্যামনা। মেহতাজের আব্বু মারা যাওয়ার পর আমায় নানা নোংরা প্রস্তাব দেয়। যখন-তখন ফোন, সামনাসামনি নানাভাবে জ্বালায়। নানা সময় শারীরিক নির্যাতন করার চেষ্টা করেছে। শেষ অব্দি আর সহ্য করতে না পেরে আমি ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাই। আসলে উনি মারা যাওয়ার পর ওনার ব্যাবসার পার্টনাররা মেহতাজ-এর নামে ৫০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছিল। ওই টাকা লুটের তালে আছে দেওর।

- তা তুমি যে বললে তুমি শ্বশুরবাড়িতে থাকো!

- হ্যাঁ . . .। বাপের বাড়িতে ফিরে চলে গিয়েছিলাম। ২ মাস মতো থাকার পর বাবা-মা জোর করে আবার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমার অনিচ্ছা

ডাকবাংলা হাসপাতালের ডাক্তাররাই তো বাইরে চেম্বারে বসে ২০০-৩০০ টাকাতে দেখে। হাসপাতালে তো কিছুই থাকে না। ডাক্তার দেখানো যায়, কিন্তু ওষুধ পাওয়া যায় না, রক্ত পরীক্ষা হয় না, নার্স নেই। আর আমার তো অত টাকা নেই বাইরে দেখানোর।

সত্ত্বেও। আমি আর বিয়ে করব না তাই আবার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসি। মাঝে শ্বশুর শাশুড়ি একবার বাপের বাড়ি এসে অনেক করে বলে ফিরে যেতে। আর দেওরও ফোনে ক্ষমা চায়। তাই ফিরে এসেছি। তবে এখন দেওর আর ছোটো বউ আলাদা থাকে, আর আমি, ছেলে, শ্বশুর, শাশুড়ি আলাদা থাকি।

- এখন তোমাদের খরচ চলে কী করে?

- শ্বশুর মজুর খাটে। আর আমি দু-বাড়িতে গিয়ে গিয়ে কয়েকজন ছাত্র, আর আমার বাড়িতে বসিয়ে এক ব্যাচ ছাত্রকে টিউশান পড়াই। ফাঁক পেলে সেলাই-এর কাজ করি। এইভাবে চলে যায়। (মুখে অল্প হলেও স্বাধীনতার হাসি . . .)

- আচ্ছা তুমি এখানে দেখাতে আস কিন্তু কোনো সরকারি হাসপাতালে যাও না? ওখানে কি ডাক্তার ভালো না?

- না না ডাক্তারবাবু . . .। ডাকবাংলা হাসপাতালের ডাক্তাররাই তো বাইরে চেম্বারে বসে ২০০-৩০০ টাকাতে দেখে। হাসপাতালে তো কিছুই থাকে না। ডাক্তার দেখানো যায়, কিন্তু ওষুধ পাওয়া যায় না, রক্ত পরীক্ষা হয় না, নার্স নেই। আর আমার তো অত টাকা নেই বাইরে দেখানোর।

- যাঃ, এত কথার মাঝে তোমার ছেলে তো ঘুমিয়ে গেল।

- হ্যাঁ . . . (ছেলেকে সামলে কোলে নিয়ে)। আজ উঠি ডাক্তারবাবু। বাড়ি পৌঁছোতে ২ ঘণ্টা লাগবে। ঘুম ভাঙলেই খাওয়ার জন্য কাঁদবে। (চলবে)

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. মৃন্ময়, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের চিকিৎসক।

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। ‘‘সন্দীপ্তাকে মনে রেখে’’ মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে ‘‘মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন’’।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

জন্মনিয়ন্ত্রণ: নারী ও সম্প্রদায়

ডা. সুমিতা দাস

জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি ব্যক্তিগত বিষয়। আবার জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি সামাজিক বিষয়। প্রথমে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যক্তিগত দিকটার কথা বলি। এক ব্যক্তি কবে বিবাহ করবে, কবে ও ক-টি সন্তানের জন্ম দেবে বা দেবে না, সেটি একটি দম্পতির যৌথ জীবনযাত্রাকে খুবই প্রভাবিত করে। বিশেষ করে নারীর সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া নারীমুক্তির দিকে এগোনো প্রায় অসম্ভব। ১৪ থেকে ৪৪ বছর বয়স যদি বছর বছর সন্তানের জন্ম দিতে আর তাদের লালনপালন করতেই কেটে যায় তাহলে নারী সামাজিক মানুষ হিসেবে তাঁর ভূমিকা পালন করবেন কী করে? পাশ্চাত্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ এসেছে নারীবাদের হাত ধরে। নারীর শরীরের ওপর, যৌনতার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণের জন্য নারীবাদীরা জন্মনিয়ন্ত্রণ চেয়েছেন, তার জন্য আন্দোলন করেছেন।

আমাদের দেশে কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ এসেছে মূলত জাতীয় নীতি হিসেবে। দেশের জনসংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বাড়ার ফলে উৎপাদন-বৃদ্ধির কোনো সুফল মানুষ চোখে দেখতে পাচ্ছে না। সুতরাং, জন্মনিয়ন্ত্রণ। লাল ত্রিকোণ। 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার' শ্লোগান। পরবর্তীকালে 'হাম দো, হামারা দো'।

সাধারণভাবে ব্যক্তিগত ও যৌন জীবনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দূরে থাক, আলোচনাতেই যেখানে আমাদের দেশবাসী শিউরে ওঠেন। কিন্তু তার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এমনিতে এত পিছিয়ে থাকা আমাদের দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের এই নীতি এসেছে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের আগে, সেই ষাটের দশকে।

বর্তমানে আমাদের দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ যেন এক পবিত্র কর্তব্য। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি কর্তব্য। জন্মনিয়ন্ত্রণ না করা মানে পিছিয়ে থাকা। সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা। দেশের প্রতি কর্তব্যে পিছিয়ে থাকা। বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের হার কম থাকাটা অনেকের কাছেই দেশবিরোধী কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই দু-টি। নারী ও জন্মনিয়ন্ত্রণ, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জন্মনিয়ন্ত্রণ।

সন্তানের জন্মদান ও লালনপালনের প্রাথমিক দায়িত্ব যেমন নারীদের, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক দায়িত্বও এসে পড়ে নারীদের ঘাড়ে। গত দুই দশকে নিরন্তর আলোচনা হয়ে চলেছে যে নারীশিক্ষা বাড়লে, নারীর স্বাধিকার বাড়লে জন্মনিয়ন্ত্রণ ঘটে। কথাটা সত্যি, কিন্তু একপেশে। জন্মনিয়ন্ত্রণই হল লক্ষ্য, নারীর স্বাধীনতা বা স্বাধিকার হল উপজাত ফসল। এই লক্ষ্যেই নারীশিক্ষার প্রচেষ্টা। আজকের কন্যাশ্রী। যাক, মন্দের ভালো।

আবার জন্মনিয়ন্ত্রণের ফল হিসেবে নারীদের ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত হয়েছে, হচ্ছে। নারীরা সারাবছর, প্রায় সারাজীবন সন্তানের জন্মদান ও লালনপালনের চক্রে বাঁধা পড়ে থাকছেন না। তাঁরা সময় পাচ্ছেন পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি পেশাগত জীবন, সামাজিক জীবন-যাপনের।

জন্মনিয়ন্ত্রণ আজ আমাদের দেশে কতটা সফল? এ নিয়ে মানুষের ধারণা আর আসল অবস্থার মধ্যে অনেক তফাত। জন্মনিয়ন্ত্রণের অভাব ও তার ফলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কি আমাদের দেশের একটা প্রধান সমস্যা? আমি গত কয়েক সপ্তাহে যতজনকে জিজ্ঞাসা করেছি, উত্তর পেয়েছি, হ্যাঁ, জন্মনিয়ন্ত্রণ আমাদের দেশের একটা প্রধান সমস্যা। আধুনিক মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার ইন্টারনেটে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দিয়ে খোঁজ করলে দেখা যাবে যে ভারতের জনসংখ্যা প্রতি বছর ১.২ শতাংশ হারে বাড়ছে, যেখানে চীনের লোকসংখ্যা বাড়ছে ০.৫ শতাংশ হারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা বাড়ছে ০.৭ শতাংশ হারে। আবার পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশে তো লোকসংখ্যা বাড়ার বদলে কমছে। তবে তা আবার অন্য সমস্যার জন্ম দিচ্ছে।

একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। আজকের বিশ্বে মানুষের যে জনসংখ্যা তা আগে ভাবাও যেত না। একটা হিসেব অনুসারে, মানবজাতির সৃষ্টি থেকে আজ অবধি যত মানুষ পৃথিবীতে পা রেখেছে তার ৬.৫ শতাংশ আজ জীবিত। অর্থাৎ গত এক লক্ষ বছরে জন্ম নেওয়া যত মানুষ তার প্রতি পনেরো জনের মধ্যে একজন এখন জীবিত।

আগে, কয়েক শতাব্দী আগেও, বেশি জনসংখ্যাকে স্বাচ্ছল্যের চিহ্ন বলে ধরা হত। কোনো দেশের বা অঞ্চলের জনসংখ্যা বেশি মানে সে দেশ বা অঞ্চল বেশি মানুষকে খাওয়াতে-পড়াতে সক্ষম। হয়তো তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি, বা সেই সমাজের উৎপাদনশীলতা, উৎপাদনক্ষমতা বেশি। জনসংখ্যা খুব বেশি বেড়ে যাওয়ার ঘটনা প্রথম ঘটে ১১ হাজার বছর আগে, মানুষ কৃষি শুরু করার সময়। গত দু-শতকে মানুষের উৎপাদনক্ষমতা অত্যন্ত বেড়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষমতা বেড়েছে। তাই জনসংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু এখন জনসংখ্যা এত বেশি বেড়ে গেছে যে মানবজাতির ভারে পৃথিবী কাতর হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে জন্মনিয়ন্ত্রণের।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা উঠলেই আসবে উনবিংশ শতকের ম্যালথাসের কথা। তিনি বলেছিলেন বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট। আর উৎপাদনক্ষমতা বাড়ে পাটিগণিতের হারে। এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা বড়ো সমস্যা। অবশ্য ম্যালথাসের এই ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়নি, জনসংখ্যা যেমন কয়েকগুণ বেড়েছে, খাদ্য উৎপাদনও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

কিন্তু এ কথা ঠিক যে বিশ্বের সম্পদ সীমিত। তাই অত্যন্ত বেশি জনসংখ্যা তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তবে জনসংখ্যা কত হলে তা বেশি হবে, সে আলোচনা কঠিন। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে এদেশের জনসংখ্যা ছিল ৪৫ কোটি, আর এখন প্রায় ১২৫ কোটি। ষাটের দশকে এদেশে মানুষ যে খেয়ে-পড়ে সুখে ছিল তা নয়। তখন এই জনসংখ্যার চাপই খুব বেশি বলে অনুভূত হয়েছিল। পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষদের মনে

থাকবে, সে সময় মধ্যবিত্তকেও দু-বেলা ভাতের অভ্যাস ছাড়তে হয়েছিল। গমের রুটির বদলে খেতে হয়েছিল ভুট্টা, বাজরা, মাইলোর রুটি। জনসংখ্যা আড়াই গুণ হওয়া সত্ত্বেও আজ এদেশের অনেক বেশি মানুষ পেট ভরে ভাত-রুটি খেতে পান।

বিশ্বের সম্পদের কথা দেখলে তৃতীয় বিশ্বের কালো-বাদামি মানুষদের সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও সাদা মানুষদের ভারেই পৃথিবী-মা বেশি কাতর। বিশ্ব উষ্ণায়ন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড নিষ্ক্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে সেটা পরিষ্কার। বেশি জনসংখ্যার ভারত নয়, কম জনসংখ্যার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের জন্য দায়ী।

তার মানে অবশ্য এটা নয় যে জনসংখ্যা যত খুশি বাড়িয়ে গেলে কোনো সমস্যা হবে না। বিশ্বের সীমিত সম্পদের ওপর বিশ্বের জনসংখ্যার চাপ বাড়লে বিপদের কারণ আছে। আর সেই বাড়তি মানুষদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে গেলে, পর্যাপ্ত ও সঠিক গুণমানের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান জোগাতে হলে, যথেষ্ট বিদ্যুৎ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পৌঁছাতে গেলে সেই চাপ আরও বাড়বে।

বিশ্বের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। (লেখচিত্র ১)। দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর বিশের দশকে। তা সর্বোচ্চ হারে পৌঁছায় গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে (২.১ শতাংশ)। তার পর থেকে জনসংখ্যা বাড়লেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমলেও ইতিমধ্যেই বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে সাতশো কোটিতে। বৃদ্ধির হার এখন মোটামুটি ১.২ শতাংশ

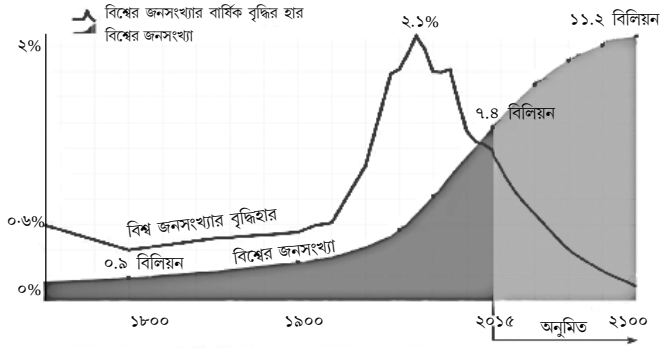

লেখচিত্র ১. বিশ্বের সংখ্যা বৃদ্ধি (১৭৫০-২১০০)

(ভারতের বৃদ্ধির হারও তাই)। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেরকমভাবে কমছে, তাতে এ শতকের শেষাশেষি জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্বের জনসংখ্যা আর বাড়বে না। তখন অবশ্য বিশ্বের জনসংখ্যা হবে ১১০০ কোটির বেশি। এখনকার প্রায় দেড় গুণ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ে আলোচনা করলে কতগুলি শব্দকে বুঝতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জন্মহার, মৃত্যুহার। জন্মহার মানে প্রতি হাজার জন পিছু প্রতি বছরে কত শিশু জন্ম নেয়। মৃত্যুহার মানে প্রতি হাজার জন মানুষ পিছু বছরে কত মানুষ মারা যান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মানে প্রতি বছরে দেশটির জনসংখ্যা কত শতাংশ বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে ভারত (১.২ শতাংশ) তো এখনও পশ্চিম ইউরোপের এগিয়ে থাকা দেশগুলি (যেখানে জনসংখ্যা মোটেই বাড়ছে না) তো বটেই, চীন (০.৫ শতাংশ) বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (০.৭ শতাংশ) থেকেও পিছিয়ে আছে। কিন্তু আমি বলব জন্মনিয়ন্ত্রণ এখন আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা নয়। কেন তা বলছি। কারণ আমাদের দেশের জন্মহার বৃদ্ধির হার দ্রুত কমছে। এ বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা আর একটি-দু-টি শব্দ ব্যবহার করব। টোটাল ফার্টিলিটি রেট (টিএফআর) আর রিপ্লেসমেন্ট লেবেল।

কাকে বলে টোটাল ফার্টিলিটি রেট?

এখন যে নারীরা বেঁচে আছেন তাদের সবার বয়স এক নয়। বিভিন্ন বয়সের নারীর ক্ষেত্রে জন্মহার আলাদা আলাদা। কুড়ি-পঁচিশ বয়সের নারী আর ৪০-৪৫ বছরের নারীর ক্ষেত্রে জন্মহার তো এক নয়। আজ বিভিন্ন বয়সের নারী গড়ে যে ক-টি সন্তানের জন্ম দেন, একজন নারী যদি সারা জীবন ধরে সেরকম সংখ্যায় সন্তানের জন্ম দেন তাহলে মোট যত সন্তানের জন্ম তিনি দেবেন, সেটার নামই টোটাল ফার্টিলিটি রেট বা টিএফআর। আসলে এটা একটা কৃত্রিম সংখ্যা। কিন্তু তার থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের আজকের অবস্থান আমরা ভালোভাবেই জানতে পারি।

টিএফআর। ছোটো করে বললে, নারী পিছু মোট সন্তান সংখ্যা। পুরুষ তো আর সন্তানের জন্ম দেয় না। নারীই দেয়। তাই টোটাল ফার্টিলিটি রেটকে দম্পতি পিছু সন্তান সংখ্যা বললেও খুব ভুল হবে না।

আজকের আলোচনায় আমরা এই সূচকটিই প্রধানত ব্যবহার করব। তার কারণ এক কথায় এটি একটি নির্ভরযোগ্য সূচক। তা জন্মনিয়ন্ত্রণের বর্তমান অবস্থাটাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে।

এই টিএফআর কত হওয়াটা কাম্য? হাম দো, হামরা দো। দম্পতি পিছু সন্তানসংখ্যা যদি দুই হয়, তাহলে জনসংখ্যা মোটামুটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। দুইয়ের বেশি হলে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। আর দুইয়ের কম হলে কমতে থাকে। তবে পণ্ডিতরা হিসেব করে দেখেছেন যে টিএফআর ২ নয়, ২.১ হওয়াটাই ভালো। সেটাই রিপ্লেসমেন্ট লেবেল। অর্থাৎ দম্পতির দু-জনের স্থান নেবে নতুন প্রজন্মের দু-জন।

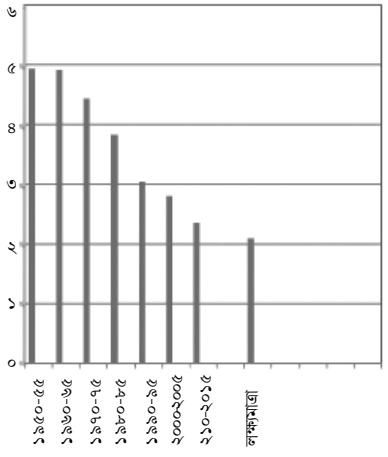

লেখচিত্র ২. বিশ্বে টোটাল ফার্টিলিটি রেট

আগেই বলেছি, গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে। তাহলে নারী পিছু সন্তান সংখ্যাও নিশ্চয় কমছে (লেখচিত্র ২) ঠিক তাই। গত শতাব্দীর ৫০-৬০-এর দশকে বিশ্বে টিএফআর ছিল পাঁচের কাছাকাছি। কমতে কমতে এখন তা আড়াইয়েরও কম—২.৩। লক্ষ্য ২.১।

বলা বাহুল্য বিশ্বের সর্বত্র অবস্থাটা একরকম নয়। বিশ্বের মধ্যে ধনবান আধুনিক পাশ্চাত্য আছে, আবার পিছিয়ে পড়া আফ্রিকার দেশগুলিও আছে।

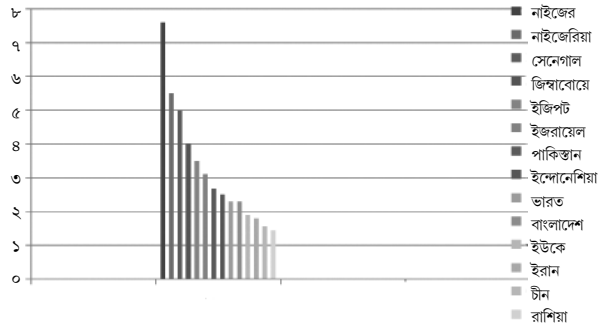

লেখচিত্র ৩. দেশপিছু টোটাল ফার্টিলিটি রেট

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেও আছে একই ধরনের ফারাক। (লেখচিত্র ৩) আফ্রিকার দেশগুলিতে নারী পিছু সন্তানসংখ্যা (টিএফআর) বেশি। সাধারণভাবে তা ৪-এর বেশি, এমনকী একটি দেশে ৭-এর ওপর।

ভারতের অবস্থা কীরকম? (লেখচিত্র ৪) এদেশেও টিএফআর কমছে। ১৯৫০-৬০- এর দশকে নারী পিছু সন্তানসংখ্যা বা টিএফআর ছিল ৬-এর কাছাকাছি। ষাট-সত্তরের দশক থেকে তা কমতে শুরু করে। এখন এদেশে নারী পিছু গড় সন্তানসংখ্যা (টিএফআর) ২.৩। লক্ষ্যের (২.১) খুব কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। আর যেভাবে দ্রুত সন্তানসংখ্যা কমছে, তাতে লক্ষ্যে পৌঁছাতে লাগবে আর মাত্র কয়েক বছর।

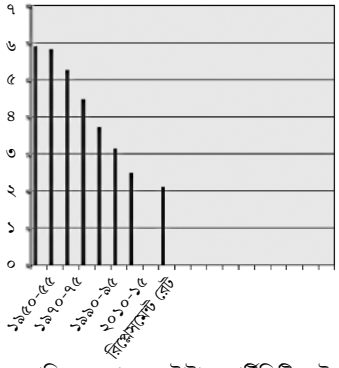

লেখচিত্র ৪. ভারতে টোটাল ফার্টিলিটি রেট

বিশ্বে যেমন বিভিন্ন অঞ্চল আলাদা ধরনের, ভারতেও তাই। এদেশকে বলা চলে প্রায় একটা মহাদেশ। সেখানে একদিকে যেমন মানবোন্নয়ন সূচকে কেরালার মতো অগ্রসর রাজ্য আছে, অন্যদিকে আছে বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মতো পিছিয়ে থাকা রাজ্য। শহরের অবস্থা একরকম, গ্রামের আর একরকম। উঁচু আর্থসামাজিক অবস্থার মানুষের সঙ্গে নীচের দিকের মানুষের জীবনযাত্রায় ফারাক বিস্তর। জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও তাই। বিহার বা উত্তরপ্রদেশে যেখানে নারী পিছু সন্তানসংখ্যা (টিএফ- আর) ৩-এর ওপর, কেরালা বা পশ্চিমবঙ্গে তা ২-এর কম। (লেখচিত্র ৫) এখানে বলে নেওয়া যায়, এখন ভারতের বড়ো রাজ্যগুলির মধ্যে টিএফআর সবচেয়ে কম আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে —১.৬। সংখ্যাটা ইউরোপের অনেক দেশের থেকে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কম।

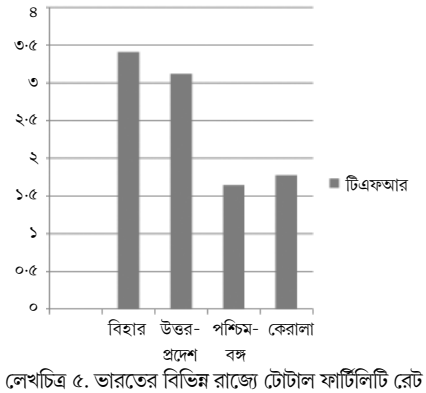

লেখচিত্র ৫. ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে টোটাল ফার্টিলিটি রেট

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের হারে কম-বেশি থাকলেও সব রাজ্যেই কিন্তু সন্তান জন্মের হার কমছে। (লেখচিত্র ৬)। কেরালায় কমেছে সবার আগে। পশ্চিমবঙ্গে গত দুই দশকে। বিহার বা উত্তরপ্রদেশে সবে কমতে শুরু করেছে। ২০০০ সালেও বিহার বা উত্তরপ্রদেশে টিএফআর ছিল ৫-এর কাছাকাছি, এখন তা ৩-এর একটু বেশি।

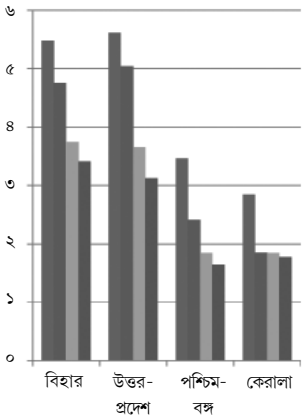

১ম স্তম্ভ ওই রাজ্যের ১৯৯০ সালের, ২য় স্তম্ভ ২০০০ সালের, ৩য় স্তম্ভ ২০১০ সালের ও ৪র্থ স্তম্ভ ২০১৩ সালের টোটাল ফার্টিলিটি রেট সূচিত করে।

লেখচিত্র ৬. ১৯৯০-২০১৩ সালে ভারতে নানা রাজ্যে মোট ফার্টিলিটি রেট যেভাবে কমেছে

অন্যভাবে বললে, বিহার-উত্তরপ্রদেশ-রাজস্থান-ছত্তিশগড় এরকম কয়েকটি রাজ্য বাদ দিলে বাকি ভারতবর্ষে নারী পিছু সন্তানসংখ্যা ২.১ বা রিপ্লেসমেন্ট লেবেলের লক্ষ্যমাত্রার নীচে নেমে গেছে। এইসব রাজ্যে আর জনসংখ্যা বা জন্মহার কমানোর প্রচেষ্টার দরকার নেই।

অদ্ভুত ব্যাপার হল, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যাওয়া নিয়ে তেমন কোনো প্রচার নেই। আজকের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষই এক সন্তান নীতির ফলে চীনের জন্মহার কমে যাওয়ার খবর রাখেন, জার্মানিতে জন্মহার কমার ফলে সেখানে কাজ করার লোক কমে গিয়ে, আর বৃদ্ধের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়ে কী ধরনের অসুবিধা হচ্ছে সে নিয়েও খবরের কাগজে আলোচনা দেখতে পাই। কিন্তু টিএফআর-এর বিচারে পশ্চিমবঙ্গে নারী পিছু সন্তানসংখ্যা যে ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কম, এ কথাটা কোথাও পড়ি না বা শুনি না। আশ্চর্য ব্যাপার।

তবে এদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা কম হয় না। সবাই জানি যে এদেশে মুসলমানদের মধ্যে জন্মহার খুব বেশি। হিন্দুত্ববাদীদের মতে, এর ফলে কিছুদিন পর এদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। দেখা যাক, অবস্থাটা কীরকম।

তবে এ আলোচনায় ঢোকার আগে আমি সম্প্রদায় নিয়ে অন্য দু-চারটে কথা বলতে চাই। সম্প্রদায় শুধু ধর্মের ভিত্তিতে হয় না। হয় ভাষার ভিত্তিতে, অঞ্চলের ভিত্তিতে, গ্রাম-শহর দিয়ে, শ্রেণির ভিত্তিতে। পাশাপাশি রাজ্য বিহার আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে

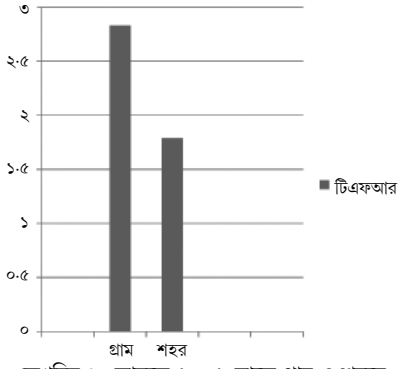

লেখচিত্র ৭. ভারতে ২০০১ সালে গ্রাম ও শহরে টোটাল ফার্টিলিটি রেট-এর ফারাক

একটি সন্তানসংখ্যার নিরিখে ভারতে সবচেয়ে এগিয়ে—পশ্চিমবঙ্গ। আর একটি সবচেয়ে পিছিয়ে—বিহার। পশ্চিমবঙ্গে টিএফআর ১.৬৪। বিহারে ৩.৪১। বলা চলে যে বিহারে পরিবার পিছু প্রায় দু-টি শিশু বেশি।

গ্রাম আর শহরের হিসেব যদি আলাদা আলাদা করে দেখি, দেখব ভারতের গ্রামগুলিতে নারী পিছু গড় সন্তানসংখ্যা (টিএফআর-এর হিসেবে) ২.৮, আর শহরে ১.৮। গ্রামীণ নারীর সন্তান গড়ে ১টি করে বেশি। (লেখচিত্র ৭)

বর্ণহিন্দুদের তুলনায় তফশিলি সম্প্রদায়ের মানুষের সন্তানসংখ্যা কিছুটা বেশি, তফসিলি উপজাতির সন্তানসংখ্যা আরও বেশি। হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সন্তানসংখ্যাও কিছু বেশি। তাদের অবস্থান তফশিলি জাতি আর উপজাতির মাঝামাঝি (লেখচিত্র ৮, তথ্যটি একটু পুরোনো)।

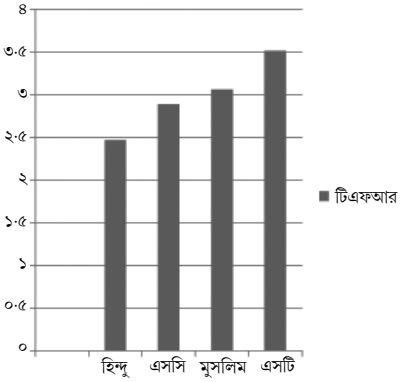

লেখচিত্র ৮. ভারতে ২০০১ সালে নানা সম্প্রদায়ের টোটাল ফার্টিলিটি রেট

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সাচার কমিটি রিপোর্ট দেখিয়ে দিয়েছে, সমস্ত অর্থনৈতিক-সামাজিক নিরিখেই মুসলমানদের অবস্থা বর্ণহিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে, প্রায়শ তফসিলি জাতিগুলির থেকেও পিছিয়ে, তফসিলি উপজাতিদের কাছাকাছি। জন্মহারের ক্ষেত্রেও সেরকমটাই হওয়ার কথা। তাই হয়েছে। ২০০১ সালের হিসেবে হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের গড় সন্তানসংখ্যা ০.৫-এর মতো বেশি।

২০০১ সালে এদেশে মুসলমানদের টিএফআর ছিল ৩-এর কাছাকাছি। বলাবাহুল্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার না করলে সেটা হতে পারত না। অর্থাৎ, আমাদের দেশের মুসলমান জনগণ জন্মনিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়ে দেশটাকে মুসলমান করার কোনো সন্ত্রাসী ব্রত নিয়ে তাঁরা জীবন কাটান না। আসলে মানুষের জীবন তো শুধু ধর্ম দিয়ে নির্ধারিত হয় না। তার ওপর স্থান-কালের প্রভাব পড়ে। প্রতিটি জীবননির্ধারণে পারিপার্শ্বিক, অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজে নারীর স্থান গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে কেউ বিহারি মুসলমান, কেউ আবার কেরালার মুসলমান। বিহারি মুসলমানের সন্তানসংখ্যা বিহারের অন্য মানুষদের মতোই কাছাকাছি, কেরালার মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা কেরালার মানুষদের কাছাকাছি।

এ তথ্যের সমর্থন মেলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। লেখচিত্র ৩-এ দেখতে পাবেন ভারতের প্রতিবেশী মুসলমান-প্রধান দেশে বাংলাদেশে টিএফআর ভারতের চেয়ে কম। পাকিস্তানে ২.৬৮, ভারতের চেয়ে সামান্য বেশি হলেও তা নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের লাফানোর কিছু নেই। কারণ হিন্দি-হিন্দু অঞ্চল, যাকে অনেকে গো-বলয় বলেন, সেই রাজ্যগুলির তুলনায় তা অনেকটাই কম। ভয়ানক ইসলামী দেশ ইরানে টিএফআর জন্মসংখ্যা ২.১-এর লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেছে। বলা বাহুল্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া এসব হয়নি। মজার ব্যাপার, ইরানে আয়াতোল্লা খোমেইনি-র ইসলামিক বিপ্লবের পর এক দশকের বেশি জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও জন্মহার কমেছে। টিএফআর কমেছে। অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণ হয়েছে। আগেই বলেছি, মানুষের জীবন শুধু ধর্ম দিয়ে নির্ধারিত হয় না। নানা দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় তা।

এবার আলোচনাটাকে গুটিয়ে আনি। জন্মনিয়ন্ত্রণের অভাব ও তার ফলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কি আমাদের দেশের একটা প্রধান বা প্রায়-প্রধান সমস্যা? এর পরিষ্কার উত্তর, না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির চাকাটা আমাদের দেশে প্রায় সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। কোনো অঘটন না ঘটলে আগামী এক-দুই দশকের মধ্যেই, আমাদের দেশের জনসংখ্যা একটা স্থিতিশীল রূপ পেয়ে যাবে। তার পর আসবে জনসংখ্যা কমার পালা।

এর মানে এই নয় যে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে এদেশে কোনো সমস্যা নেই। অনেক সমস্যাই আছে। যেমন, অল্পবয়সে বিয়ে ও সন্তানধারণ। তাছাড়া, জন্মনিয়ন্ত্রণের তথ্য বা ব্যবস্থা অনেক নারীর কাছেই পৌঁছায় না। জন্মনিয়ন্ত্রণের দায় ও দায়িত্ব থেকে যায় নারীর কাঁধেই, যদিও এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার প্রায়শ তার হাতে থাকে না। প্রায়ই ঠিকমতো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার না করার ফলে নারীদের বারবার গর্ভপাতের আশ্রয় নিতে হয়, যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়। এছাড়া, জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতিগুলি, যেমন প্রাকৃতিক পদ্ধতি, কনডোম ব্যবহার, নারীদের পিল ইত্যাদির তুলনায় স্থায়ী পদ্ধতি নেওয়া হয় বেশি। যার অর্থ, অত্যন্ত কম বয়সে মেয়েদের লাইগেশন অপারেশন।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এখনও প্রধান পদ্ধতি নারীদের অপারেশন বা লাইগেশন। ৩০ শতাংশ দম্পতি এই পদ্ধতিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করেন। অথচ তুলনায় অনেক সহজ পদ্ধতি পুরুষের অপারেশন বা ভ্যাসেকটমি করা প্রায় হয়ই না (০.১ শতাংশ)। এই সংখ্যাটি আবার দিন দিন কমছে। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ্ সার্ভে এবছর তাঁদের সমীক্ষায় শহরে একটিও দম্পতি পাননি যারা ভ্যাসেকটমি করিয়েছেন।

এটা শুভ সংবাদ নয়। কারণ, টিউবেকটমির তুলনায় ভ্যাসেকটমি অনেক ছোটো ও সহজ অপারেশন। কিন্তু আমাদের দেশে নারীর মূল্য পুরুষের তুলনায় এতই কম যে ভ্যাসেকটমি প্রায় হয়ই না, চলে টিউবেকটমি। স্ত্রী মারা গেলে বা বিবাহবিচ্ছেদ হলে পুরুষটি পুনর্বিবাহ করতে পারেন, তাই তাঁর সন্তানধারণ ক্ষমতা রক্ষা করা দরকার। স্বামী মারা গেলে স্ত্রী-র ক্ষেত্রে এসব ভাবার দরকার নেই। শুধু তাই নয়, নারীর শরীর খারাপ হওয়া আর পুরুষের শরীর খারাপ হওয়া তো সমান নয়। আর এসবের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হল এ নিয়ে গভীর নীরবতা। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি কেন শুধু মেয়েদের ব্যাপার হবে, গায়নোকলোজিস্টদের ব্যাপার হবে, কেন লাইগেশন বেশি হবে, ভ্যাসেকটমি নয়—এ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই কোথাও।

জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যাটি অবশ্য অন্য। সেটি হল নারীদের সংখ্যা কমে যাওয়া। অন্য ভাষায় বললে, সেক্স-রেশিয়ো বা জেন্ডার-রেশিয়ো কমে যাওয়া। জেন্ডার রেশিয়ো মানে পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা। আমাদের দেশে যে সূচকটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় তাতে ১০০০ জন পুরুষ প্রতি নারীর সংখ্যা বিচার করা হয়।

এই সংখ্যাটি কত হওয়ার কথা? জন্মের সময় পুরুষ শিশুর সংখ্যা সামান্য বেশি হয়, হাজারে পাঁচ-ছ জন বেশি। কিন্তু যদি সমাজে নারীর অবস্থান উন্নত হয় তাহলে নারীর আয়ুষ্কাল বেশি হয় আর সেক্ষেত্রে মোট জনসংখ্যায় ১০০০ পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা হয় এক হাজারের বেশি। আমাদের দেশে তা নয়। এ দেশে হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ৯৩৩। (লেখচিত্র ৯) অর্থাৎ প্রতি হাজারে ৭০টি নারী হারিয়ে যাচ্ছেন।

এখানেও আঞ্চলিক পার্থক্য আছে। পার্থক্য আছে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে। কিন্তু এবার ফারাকটা একটু উলটো ধরনের। গ্রামের তুলনায় এই সমস্যা

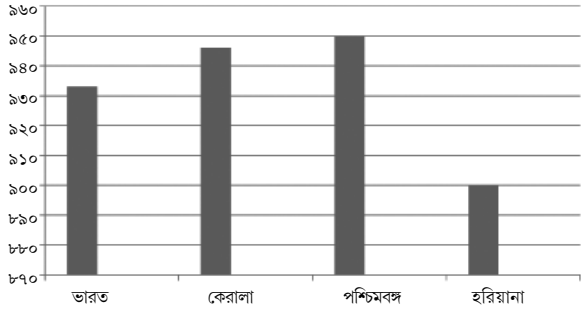

লেখচিত্র ৯. ভারতে রাজ্যভিত্তিক জেন্ডার রেশিয়ো

শহরে বেশি। শহরে হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা মাত্র ন-শো। এটা ঠিক যে জীবিকার জন্য অনেক সময় পুরুষ নারীকে গ্রামে রেখে শহরে আসে। সেটা মূল কারণ হলে তো গ্রামে নারীর সংখ্যা হত বেশি। কিন্তু সে গুড়েও বালি।

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও অবস্থাটা সব রাজ্যে একরকম নয়। পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালার অবস্থা কিছুটা ভালো (সাড়ে ন-শো), আর সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হরিয়ানায়। সে রাজ্যে হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা মাত্র ৯০০। হরিয়ানায় অনেক গ্রাম আছে যেখানে পাঁচ বছরের নীচে কোনো নারী-শিশু নেই। এই ভয়ানক অবস্থা চলতে থাকলে তার সামাজিক ফল কী হতে পারে বুঝতে সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট।

এখানে যদি আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিষয়টা দেখি, দেখব সবচেয়ে ভালো অবস্থা খ্রিস্টানদের। তাদের মধ্যে এক হাজার পুরুষ প্রতি নারীর সংখ্যা এক হাজারের বেশি। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তুলনা করলে এ ক্ষেত্রে মুসলমান নারীর অবস্থা সামান্য ভালো। ধর্ম সম্প্রদায়ের বিচারে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা শিখ নারীর।

এমনটা বলা যায়, নারী হয়ে এ দেশে জন্ম নিতে হলে শহরে, হিন্দু বা শিখ পরিবারে চেষ্টা না করাই ভালো। জন্মটাই হয়তো হয়ে উঠবে না। তবে এ সমস্যা শুধু আমাদের দেশের নয়। বিশ্বে ভালো খারাপ সব এলাকা মিলিয়ে হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা হাজারের বেশ খানিকটা কম—৯৮৮। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলো, লাতিন আমেরিকা আর দক্ষিণ আফ্রিকায় হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা হাজার বা তার বেশি। অন্য দিকে চীন, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া আর উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে দেশের হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা হাজারের কম।

কীভাবে ঘটছে এ ঘটনাটা? মূল কারণ এসব অঞ্চল তুলনায় কম উন্নত, এখানে নারীর সামাজিক অবস্থান খারাপ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে পুরোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক কারণের পাশে আছে পণ নামক কুৎসিত ব্যবস্থাটি। পণের কারণে পুত্রসন্তান অর্থকরী এবং কন্যাসন্তান দায় বলে গণ্য হয়।

কীভাবে একটি সমাজে নারীর সংখ্যা কম হয়ে যায়? কারণ হিসেবে নবজাত কন্যাসন্তান হত্যা, স্ত্রী ভ্রূণ হত্যা, অবহেলার ফলে মৃত্যু—মূলত এই তিনটির কথা বলা যায়।

কন্যাসন্তানকে নুন খাইয়ে বা জলে ডুবিয়ে মারার বিষয়টি প্রাচীন প্রথা। পুত্রসন্তান যত্ন পায়, কন্যাসন্তান যে তা পাবে না, সেটাও জানা কথা। তবে স্ত্রী-ভ্রূণহত্যার ব্যাপারটা নতুন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে এসেছে এটি।

এই অপরাধটি নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। পয়সার বিনিময়ে অনৈতিক ডাক্তারবাবুরা দম্পতিকে জানাচ্ছেন যে আপনাদের শিশুটি কন্যাসন্তান হবে, এবং দম্পতিটি তখন গর্ভপাত করে নিয়ে পরবর্তীতে পুত্রসন্তানের অপেক্ষা করতে থাকে।

গত শতকের আশির দশকে আলট্রাসোনোগ্রাফি, তারপর অ্যামনিও-সেন্টেসিস আর আল্ট্রাসোনোগ্রাফির উন্নতির ফলে গর্ভস্থ ভ্রূণ স্ত্রী কি পুরুষ তা জানা সম্ভব হয়েছে। ডাক্তার জানতে পারলেও সেটা দম্পতিকে জানানোটা আইনত অপরাধ। কিন্তু এই অপরাধটি নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। পয়সার বিনিময়ে অনৈতিক ডাক্তারবাবুরা দম্পতিকে জানাচ্ছেন যে আপনাদের শিশুটি কন্যাসন্তান হবে, এবং দম্পতিটি তখন গর্ভপাত করে নিয়ে পরবর্তীতে পুত্রসন্তানের অপেক্ষা করতে থাকে। বিশেষ বিশেষ ডাক্তার বা নার্সিংহোমের নাম হয়ে গেছে যে ওখানে গেলে পুত্রসন্তানই হবে। তার পদ্ধতিটি এইরকম। সাধারণভাবে সমাজ, পরিবারের পাশাপাশি এখানে ডাক্তারদের একটা বড়ো ভূমিকা আছে, অপরাধীর ভূমিকা।

স্ত্রী শিশু ও বিশেষ করে ভ্রূণহত্যা চলছে মারাত্মক আকারে। সাধারণভাবে এটুকু বলা যায় যে পরিবারে কন্যাসন্তানকে যতদিন দায় বলে মনে করা হবে, ততদিন এ ব্যাপারটা ঘটতে থাকবে। তবে আইনের শাসন, দোষীদের শাস্তি, পণপ্রথার বিরুদ্ধে এবং সাধারণভাবে নারীদের ক্ষমতায়ন নিয়ে সামাজিক আন্দোলন এ অপরাধ কিছুটা হলেও কমাতে সক্ষম।

সব মিলিয়ে তাই বলা চলে যে জন্মের হার কমলেও জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে অনেক কাজ বাকি আছে। শুধু বিহার উত্তরপ্রদেশ রাজস্থানে জন্মহার কমানোর কাজ নয়। স্ত্রী-ভ্রূণ হত্যা, স্ত্রী-শিশু হত্যা বন্ধ করা। টিউবেকটমি আর ভ্যাসেকটমির মধ্যে অসমান সম্পর্ক বন্ধ করা। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নারীপুরুষের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্য ও ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া। নাবালিকাদের বিয়ে ও সন্তানধারণ বন্ধ করা। এগুলি খুবই জরুরি কাজ। এগুলির পেছনে যোগাযোগের একটি সূত্র আছে। নারীর ক্ষমতায়ন। আর তা শুধু সরকারি যোজনার হাত ধরে আসবে না, দরকার সামাজিক আন্দোলন। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. সুমিতা দাস, এমবিবিএস, সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি বিষয়ক এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

বাড়ি থেকে বাজেট, কটাক্ষের লোক বেশি, ভাবার মানুষ কম

এষা মিত্র

বছর কয়েক আগেও বাজেটের দিন কটাক্ষ শুনতে হত মেয়েদের। আয়করে মেয়েদের জন্য আলাদা ছাড় থাকত আর পুরুষেরা বলতেন, 'আবার দেখো, সব জায়গায় সুবিধা পাবে।' কেন, কী সুবিধা, ইত্যাদি তর্ক করেও মেনে নিতে হত, সুবিধা আছে বটে। তবে বছর কয়েক হল, সেই কটাক্ষ থেকে ছাড় মিলেছে। কারণ, আয়করের ক্ষেত্রে মেয়েদের ছাড়ের সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত আপাতত আর নেওয়া হয় না।

প্রসঙ্গটা তোলার অর্থ এই যে আয়কর ছাড় কেন মেয়েরা বেশি পাবেন, তা নিয়ে ব্যঙ্গ করার লোক যত, বাজেটে মেয়েদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ল না কমল, তা নিয়ে সামান্যতম কৌতূহল দেখানোর মানুষ তার সিকি-সিকিভাগও নয়। তেমনই সংবাদমাধ্যম। ভারতে হাতে গোনা কয়েকটি সংবাদপত্র মেয়েদের খাতে বরাদ্দ বাবদ একটি 'কপি' করেই দায় সারে। বৈদ্যুতিন মাধ্যম তার ধারেকাছ দিয়েও যায় না। যদি না বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মতো নাটকীয়ভাবে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে 'বেটি বচাও' বা অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু তারপর? সেই টাকা কীভাবে খরচ হল, মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য ঘটাপটা করে নির্ভয়া তহবিল গঠন করা হলেও সেই টাকা কীভাবে খরচ হচ্ছে, তা অনুসন্ধানের কৌতূহল নেই। বৎসরান্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া ভাষণে অন্তঃসত্ত্বাদের (যাঁরা সরকারি হাসপাতালে গিয়ে প্রসব করাবেন এবং সদ্যোজাতদের টিকাকরণ করাবেন) অ্যাকাউন্টে যে ৬০০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করা হল, সেই সংস্থান যে ২০১৩ সালে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনেই করা হয়েছিল অথচ রূপায়ণ করা হয়নি, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর লোক নেই। তাহলে?

এসব প্রশ্ন নিয়েই সাম্প্রতিক বাজেটের দিকে তাকানো যাক। *মিন্ট* পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে বিভিন্ন মন্ত্রকে মেয়েদের জন্য প্রকল্পে বরাদ্দ ৫৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। গত অর্থবর্ষে মহিলাকেন্দ্রিক প্রকল্পে বরাদ্দ ৫০০০ কোটি টাকা ছেঁটে সমালোচনার মুখে পড়েছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। এবার ন্যাশনাল মিশন ফর এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ হয়েছে, মেয়েদের জন্য হেল্পলাইন এবং ক্রাইসিস সেন্টার গঠনের জন্য (নির্ভয়া প্রকল্প) অতিরিক্ত ৪৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। যদিও দেশে ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহের ঘটনা যেভাবে বাড়ছে, নিত্য তার খবর পড়তে পড়তে এইসব প্রকল্পের কার্যকারিতা বোঝা দায়। বিশেষত নির্ভয়া প্রকল্পের!

২০০৫ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার 'জেন্ডার রেসপনসিভ' বাজেট চালু করেন। এর দু-টি ভাগ, কিছু প্রকল্পে বরাদ্দের ১০০ শতাংশই মেয়েদের জন্য (পার্ট এ), আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রকল্পের ৩০ শতাংশ বরাদ্দ মেয়েদের জন্য (পার্ট বি)। মেয়েদের জন্য বাজেটে সামগ্রিক বরাদ্দ পার্ট এ এবং পার্ট বি মিলিয়েই হিসেব করা হয়। এবং একাধিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদন বলছে, পার্ট বি-তে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ কত বাড়ল, তার হিসেব পাওয়া কঠিন।

সংশয় আরও রয়েছে। *মিন্ট* পত্রিকার ওই প্রতিবেদন জানাচ্ছে, নারী এবং শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ গত অর্থবর্ষের মতোই রয়েছে। এক পয়সা বাড়েনি। পারিবারিক হিংসার শিকার মেয়েদের জন্য কোনো বরাদ্দই হয়নি। মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের জন্য প্রিয়দর্শিনী প্রকল্পেও বরাদ্দ হয়নি। আবার *বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকা জানাচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধি মাতৃত্ব সহযোগ যোজনার বরাদ্দ এবার ৩২৬ শতাংশ বাড়ানো হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য, গণবণ্টন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির রিপোর্টেই ২০১৩ সালে জানানো হয়েছিল, এই প্রকল্পে প্রতি বছর ২২.৫ মিলিয়ন মেয়ে এই প্রকল্পের আওতায় পড়েন। আবার অনেকেই বলেন, মা না হলে কি মেয়েদের কথা ভাবা হবে না? সরকারি বরাদ্দে কিশোরীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কোথায়?

> হক কথা। দায়িত্ব মেয়েদেরই। পরিবারে মা না হওয়া মেয়েই হন বা হবু মা বা মা-ই হন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের পুষ্টির জোগাড় তাঁর নিজেকেই করতে হবে। এবং অন্যদের ভালো রাখার দায়িত্বও। সন্তান না হলে বিবাহিত মেয়েকে বন্ধ্যা আখ্যা দেওয়াটাই আগে হয়, তাঁর স্বামী বা সঙ্গীর অক্ষমতার সম্ভাবনা উহ্য থেকে যায়।

কিন্তু এগুলো নিয়ে কথা বলা, ভাবনার লোক কম। এ ক্ষেত্রে সরকারের সমালোচনা করাই যায়, করা উচিতও। তবে প্রশ্ন এটাও যে বরাদ্দ সরকার বাড়ালেও তা ঠিকমতো কাজে লাগছে কি? হবু মায়েদের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরিকাঠামো বা সেখানকার পরিকাঠামোর অবস্থা কী? আর তাঁকে নিয়েই বা যাবেন কে? হবু মায়েদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কথা বলা হয়, সরকার সেজন্য

টাকাও বরাদ্দ করেন, কিন্তু সেই খাবার মেয়েটির মুখে কতটা যায়? বাড়ির অন্য সদস্যেরা তাঁকে নিয়ে কতটা ভাবেন?

আমার ঠাকুমা বলতেন, মা হওয়া কি মুখের কথা? প্রসব করলে হয় না মাতা!

হক কথা। দায়িত্ব মেয়েদেরই। পরিবারে মা না হওয়া মেয়েই হন বা হবু মা বা মা-ই হন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের পুষ্টির জোগাড় তাঁর নিজেকেই

গত বছর লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের আগে হিসাব কষে দেখা গিয়েছিল, শৌচাগার গঠনের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে পৌঁছোনো যায়নি এবং দেশের বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্পগোষ্ঠী প্রাথমিকভাবে মুখে বড়ো বড়ো কথা বললেও এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রায় শূন্য বললেই চলে।

করতে হবে। এবং অন্যদের ভালো রাখার দায়িত্বও। সন্তান না হলে বিবাহিত মেয়েকে বন্ধ্যা আখ্যা দেওয়াটাই আগে হয়, তাঁর স্বামী বা সঙ্গীর অক্ষমতার সম্ভাবনা উহ্য থেকে যায়। সন্তান হওয়ার পর তার পুষ্টি থেকে শুরু করে তার লেখাপড়া স্কুলে আনা-নেওয়া, তাকে বড়ো করা, শিক্ষা দেওয়া সব দায়িত্ব মূলত মায়েদের বলেই ধরে নেওয়া হয়। তা সে মা যতই চাকরি করুন বা না-ই করুন। বাচ্চাকে কী শিক্ষা দিয়েছ—এই কথাটা মেয়েদের শুনতে হয় পরিবারের কাছ থেকেই। এটাই মুখ্য প্রবণতা।

প্রতি স্কুলে শৌচাগার নির্মাণের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাতে কাজ কতটা হয়েছে? শৌচাগার না থাকায় কত মেয়ে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, বা সারাদিন স্কুলে প্রাকৃতিক ডাক চেপে থেকে অসুখে পড়ে, সে পরিসংখ্যান কিছুটা থাকলেও কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়? গত বছর লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের আগে হিসাব কষে দেখা গিয়েছিল, শৌচাগার গঠনের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে পৌঁছোনো যায়নি এবং দেশের বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্পগোষ্ঠী প্রাথমিকভাবে মুখে বড়ো বড়ো কথা বললেও এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রায় শূন্য বললেই চলে। বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণে সহায়তার জন্য সরকারি কর্মসূচি রয়েছে, কিন্তু তা নেওয়ার মানসিকতা কত জনের? সংবাদপত্রের রিপোর্ট জানায়, দেশ জুড়ে বিভিন্ন মেয়ের কথা, যারা বাধ্য করছেন বাবা বা স্বামীকে শৌচাগার তৈরি করতে।

অতএব? ব্যক্তিগত স্তর থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক, সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্র, যা-ই হোক, মানসিকতার বদল জরুরি। নইলে বাজেট বরাদ্দ কম না বেশি, ওই একদিনের হিসাবেই মেয়েদের স্বাস্থ্যচিন্তা আটকে থাকবে। রাজনীতি যদি বলে ধর্ষণের দায় মেয়েদেরই, সমাজ তাকে একঘরে করে রাখে বা নগ্ন করে রাস্তায় হাঁটায়, কাজ সেরে রাতে ফিরলে বিপদের সম্ভাবনা অবধারিত যেখানে, সেখানে বাজেট বরাদ্দ ঠিক খাতে ঠিকভাবে রূপায়ণ করা বা সেই রূপায়ণের মাত্রা পরখ করতে সামাজিক অডিট আকাশকুসুম মাত্র। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

লেখক একজন প্রাবন্ধিক।

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

সপ্তম পর্ব

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

‘ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে’ পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে, ২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপি-র অনেক আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

এবারে বাবুর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হল। তিনি জিগেস করলেন, ‘কেমন আছ?’ বললাম, ‘ভালো’। ‘অসুখটা কি একটু কমেছে?’ বললাম, ‘না, আগের মতোই আছে।’ ‘কিন্তু তুমি আমাকে বলো, ওরকম যখন-তখন ফিট পড় কেন?’ আমি কোনো জবাব দিলাম না। কিন্তু তিনি একেবারে নাছোড়। শেষমেশ আমি বললাম, ‘আমি খুব ভয় পেয়েছি।’ তিনি ফের জিগেস করলেন, ‘কী থেকে তোমার এত ভয়?’ তাঁকে আমি কী করে বলি ভয়ের আসল কারণটা কী। একবার ভাবলাম, বলেই ফেলি। কিন্তু তাঁর সামনে মুখ খুলব কী, তরাসে আমার বুকে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। তিনি বললেন, ‘আমার কাছে এসো তো দেখি।’ আমি বললাম, ‘না, আমি এখানেই ঠিক আছি।’ তিনি বললেন, ‘এ তো আচ্ছা জ্বালা! তোমার এত গুমোর কীসের? আমার কাছে আসতে গেলে তোমার কি মাথা কাটা যায় না কি?’ আমি যেহেতু আমার জায়গাতেই অটল তিনি একটানা নানা কথা বলে যেতে লাগলেন: ‘জানো, আমার মেজোবউ বিয়ের রাতেই আমার সঙ্গে কথা বলেছিল।’ তারপরে কী হয়েছিল তা নিয়েও বিশদে নানা কথা বলতেই থাকলেন। ও-সব কথা আমার কলমের ডগায় আসবে না। এরকম করে কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন তিনি আমার হাত ধরে টানাটানি করে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন। আমি গলায় সবটুকু জোর দিয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করতে শুরু করলাম। চিৎকার শুনে শাশুড়ি ছেলেকে বললেন,‘ওকে মেরেছিস না কি তুই?’ ছেলে জবাব দিল,‘না, মা, ও বিছানা থেকে পড়ে যাচ্ছিল, আমি ধরতে গেছি, ওমনি ও চিৎকার জুড়ে দিল।’ তখন এ নিয়ে আর কেউ কথা বাড়াল না।

পরের দিন পরাণবাবুর রক্ষিতা শ্যামা আমাকে নিরালায় এককোণে ডেকে নিয়ে বলল, ‘স্বামীকে তোর গায়ে হাত দিতে দিস না কেন তুই? অমন চিৎকার চ্যাঁচামেচি করা কি ভালো দেখায়? তুই কি বুঝিস না, লোকজন তোকে নিয়ে আড়ালে আকথা-কুকথা

‘স্বামীকে তোর গায়ে হাত দিতে দিস না কেন তুই? অমন চিৎকার চ্যাঁচামেচি করা কি ভালো দেখায়?

বলে? তোর কত্তার আজ হরিশবাবুর কাঁধে মাথা রেখে সে কী কান্নকাটি! বলে, ‘‘আমার বউটা একদম বুনো’’, আরও কত কথা। হরিশবাবু আমাকে বললেন, ‘‘শ্যামা, যা তো, বউটাকে সবকিছু ঠিকঠাক করে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে আয়।’’ সেজন্যই তো আমার তোর কাছে আসা। এখন নে, চটপট শিখে ফেল তো সব। কত্তা যা বলেন, মন দিয়ে শুনবি, কখনো কথার অবাধ্যি হবি না। তিনি তোর পাশে টানটান হয়ে শুড়ে পড়ে তোকে আদরে-সোহাগে ভরিয়ে দেবেন; নানা রতিখেলায় মেতে উঠবেন; তুই যদি তখন লক্ষ্মীটি হয়ে থাকিস, তবেই তো ওর তোকে মনে ধরবে, তোর দিকে টান

আসবে। তবেই তো পীরিতির আসল মজা পাবি তুই। চেষ্টা কর একজন দাসীর মতো চলতে। ও তোকে যা করতে বলবে, তা যদি তুই মুখ বুজে সব করতে পারিস তাহলে ও শাড়ি-গয়নায় তোর সব্বাঙ্গ ভরিয়ে দেবে—দেখে নিস।' আমি মুখে রা-টি না কেড়ে শুনছিলাম, তারপর বললাম, 'শ্যামা দিদি, আমার যে খুব ভয় করে।' 'কীসে তোর এত ভয় শুনি?' 'কীসের ভয় আমি বলতে পারব না, তবে ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুমদুম করে কে যেন কিল মারতে থাকে।' সে বলে, 'চেষ্টা কর, বুকে সাহস আন, দেখবি ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই।' এইসব একগাদা উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে শ্যামা চলে গেল। আমি বসে বসে সারাটা দিন ধরে ভাবলাম। কী করব আমি? তখন কী ঘটবে? আমাকে নিয়ে কী ভয়ানক ঘটনা তিনি ঘটাবেন—কে জানে!

তোর কত্তার আজ হরিশবাবুর কাঁধে মাথা রেখে সে কী কান্নকাটি! বলে, ''আমার বউটা একদম বুনো'',

সন্ধ্যেয় অফিস থেকে ফিরে এসে কর্তা মায়ের পাশে বসে হালকা কিছু জলযোগ সারলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'মা, মনে হয় আমার জ্বর এসেছে। ক-দিন ধরেই বুকের নীচের দিকটায় একটা ব্যথা ব্যথা ভাব, ও থেকেই মনে হয় জ্বরটা এসেছে।' রাতে তিনি কিছু খেলেন না। জ্বর বাড়তে লাগল। তিনি আমাকে পা টিপে দিতে বললেন। আমি শরমে মরে গিয়ে কোনোমতে তাঁর পা টিপতে বসলাম। পা টিপতে টিপতেই কোনো এক সময় তাঁর পায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়লাম, খেয়ালই নেই। অনেক রাতে চটকা ভেঙে গেল; দেখি তিনি আমাকে টেনে টেনে বালিশে আমার মাথাটা দিয়ে শোওয়ানোর চেষ্টা করছেন। তাঁর গা এত গরম, জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে। তরাসে আমি উঠে বসলাম। তিনি বললেন, 'বাতাস করো।' আমি ঘুম-চোখে দায়সারাভাবে তাও করতে লাগলাম। এইরকম করে রাতটা কেটে গেল কোনোমতে।

পরের দিন শাশুড়ি ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার এসে ওঁর বুকে কল বসিয়ে, নাড়ি টিপে ভালো করে পরীক্ষা করলেন। ওঁর পাঁজরে আর লিভারে ব্যথা হচ্ছিল। ডাক্তার আশু মিত্রকে বললেন, 'রোগীর হাল তো খুবই খারাপ। ওঁর লিভারে একটা ফোঁড়া হয়েছে, সঙ্গে জুটেছে নিউমোনিয়া। এমন অবস্থায় তো বেঁচে থাকাই মুশকিল। ওঁর ভাইদের খবর দাও।' শহরের নামি ডাক্তার দুর্গাচরণবাবু যদি এমন কথা বলেন তখন কীই-বা বলার থাকতে পারে? জ্বর ১০৫ ডিগ্রির নীচে নামছে না। আমি শাশুড়ির ঘরে গিয়ে বসে রইলাম। সকলে মিলে হামলে পড়েছে ওঁর সেবাশুশ্রূষা করার জন্যে। ওঁর মেজদা এলেন; কিছু পরে আমার বাবা। বাড়িটায় যেন একটা ডামাডোল বেধে গেল। এইভাবে কেটে গেল তিন সপ্তাহ। ওঁকে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে মুরগির জুস বোতলে করে খাওয়ানো হত। পাঁচি আর বুচি ওঁর পাশে গিয়ে বসে থাকত। আমি ঘরে একা-একাই দিন কাটাতাম। কেউ যদি খেতে দিল তো খেতাম নইলে চুপচাপ শুয়ে থাকতাম। শাশুড়ির তো নাওয়া-খাওয়া-ঘুম সব মাথায় উঠেছিল। কোনোদিন এক দলা সেদ্ধ ভাত, কোনোদিন-বা একমুঠো ময়দা জলে গুলে গিলে নিতেন। ডাক্তার দিনে দু থেকে তিন বার এসে ওঁকে দেখে যেতেন। একদিন এক ইউরোপীয় ডাক্তার ডাকা হল। পড়শি ভদ্রলোক সকাল-বিকেল দু-বেলা রোজ আসতেন।

একদিন বিকেলে পাঁচি এসে আমায় বললে: 'মা ও-ঘরে চলো, বাবা তোমায় ডাকছেন।' ঘরে কেউ ছিল না; ঢুকতে কেমন বাধো বাধো ঠেকছিল। শাশুড়ি বললেন: 'যাও না, ও-ঘরে গিয়ে ওকে একটু হাওয়া করো না। বসন্ত, আশু অন্যরা সারা রাত ধরে ওকে বাতাস করে ক্লান্ত হয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি ওর কাছে বোসো, আমি হাঁড়িতে দু-মুঠো চাল চাপিয়ে দি।' এ-কথা শোনার পর আমি ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলাম। দেখা মাত্র তিনি আমাকে ডাকলেন, 'এসো, আমার কাছে এসো বোসো।' সে-দিন সব জড়তা কাটিয়ে আমি ওঁর কাছে গেলাম। পাখার হাওয়া দিতে লাগলাম। তিনি বললেন, 'একটু হাত বুলিয়ে দাও।' যা যা করতে বললেন, আমি করলাম। বললেন, 'তুমি জানই না, তোমার কী সর্বনাশ আমি করেছি। একরত্তি এক মেয়ে তুমি, আর তোমার কপালেই কি না যত দুর্ভোগ! এখন তোমায় কে দেখবে? গত ক-দিন ধরে আমার মাথায় আর অন্য কিছু নেই। আমি বাঁচব না। ডাক্তার বলেছেন, কোনো মদ্যপকে যদি নিউমোনিয়ায় ধরে তবে তার বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। এত খারাপ দশা আমার আর কোনোদিনও হয়নি। লিভারে একটা ফোঁড়াও হয়েছে। যে-দিন ফোঁড়াটা ফাটবে, সে-দিনই মরে যাব। যে ক-দিন বাঁচি, রোজ একবার এসে দেখে যেও।' ওঁর এত কষ্ট দুর্দশা আমি আর সইতে পারছিলাম না। মনের দুঃখে কষ্টে কেঁদে ফেললাম। তিনি তখন হাঁপরের মতো শ্বাস টানছিলেন আর তাঁর গোটা শরীর জুড়ে কাঁপুনি দিচ্ছিল। ওই অবস্থাতেই তিনি আমার চোখ

'এইমাত্র যে নারী বিধবা হল, তাকে আমি কী আশীর্বাদ করতে পারি!' ওই একই কথা বার বার তিনি উন্মাদের মতো আউড়ে যেতে লাগলেন।

মুছিয়ে দিলেন। ঘরে বাইরের অনেক লোক ঢুকে ভিড় করছে দেখে আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তিনি জোরে জোরে বলে উঠলেন, 'এইমাত্র যে নারী বিধবা হল, তাকে আমি কী আশীর্বাদ করতে পারি!' ওই একই কথা বার বার তিনি উন্মাদের মতো আউড়ে যেতে লাগলেন। ওঁর বড়ো ভাই এসে ওঁকে কিছু ওষুধ আর খাবার দিয়ে বললেন, 'এবার ঘুমিয়ে পড়ো।' তিনি ছটফট করতে করতে ওই একই কথা ঘুরেফিরে বলতে লাগলেন, 'মেজদা! যে মেয়েটা এক্ষুনি বিধবা হল, ওকে আমি কী আশীর্বাদ দেব, বলতে পারো!' মেজদা বললেন, 'কে এখুনি বিধবা হল? ভুলভাল বোকো না তো, যত্ত সব পাগলের প্রলাপ! স্থির হয়ে চুপচাপ ঘুমোনোর চেষ্টা করো।' তিনি বললেন, 'মেজদা তুমি আমাকে ছেলে ভোলাচ্ছ? এই দেখো আমার বউ সধবাদের মতো শাড়ি পরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে; ও তো এখুনি বিধবা হল।' শুনে মেজদা নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

সন্ধ্যায় ডাক্তার ডাকা হল। তিনি ওঁর মাথায় অডিকোলন মাখিয়ে বুকে জলপটি দিলেন। সারা রাত জেগে সকলে মিলে তাঁর শুশ্রূষা করতে লাগল। একজন কবিরাজকেও ডাকা হল, তিনিও দাওয়াই-পথ্যর ব্যবস্থা

দিলেন। ডাক্তারে বদ্যিতে সকলের ব্যতিব্যস্ততায় যেন-বা এক যজ্ঞিবাড়ির ধূম পড়ে গেছে। রাতটা কোনোমতে কাটল। ট্যাঁপা ব্রজ আর কয়েকজন বেবুশ্যে সকালে তাঁকে দেখতে এল। ওঁর এমন দশা দেখে কাঁদতে শুরু করল। তিনি বললেন, 'এখন মড়াকান্না কেঁদে কী হবে? তোমরাই তো এই সর্বনাশটা আমার করলে! অযথা চোখের জল না ফেলে এখন বিদেয় হও তো বাপু। আমি তোমাদের শেষ বিদেয় জানাচ্ছি; যাও, দয়া করে চলে যাও।' ওরা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। মেজদা এসব শুনে বেশ বিরক্ত। বললেন, 'কেন যে এসব অলপ্পেয়ে ছেনালগুলো জ্বালাতে আসে! ডাক্তার তো বলেই দিয়েছেন, কোনোরকম উত্তেজনা ওর সইবে না; যখন-তখন হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে যেতে পারে। মা, এই নচ্ছারগুলোকে একদম ওর কাছে ঘেঁসতে দেবে না, ওর বউও যেন ওর কাছে না যায়।'

এ-কথা বলে ঘরে ঢুকে তিনি চিৎকার করে ডাকলেন: 'শশধর, আশু!' ওরা ছুটে ঘরে ঢুকে 'ওঁকে ধরে থাকো, ওঁকে ধরে থাকো' বলতে লাগল। কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে ওঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। হরিশবাবু, আশু আর শশধর 'হরে রাম, হরে রাম' ধ্বনি দেওয়া শুরু করল। মেজো ভাশুর শাশুড়িকে জাপটে ধরে রইলেন। আমার বাবা এলেন, বসে পড়লেন—তাঁর মাথায় হাত। দরজার এক কোণ ধরে আমি একটা শক্ত কাঠের মতো দাঁড়িয়ে। কী হচ্ছে-না-হচ্ছে কিছুই মাথায় ঢুকছে না—কেমন একটা বিবশ, বেভুল, হতবুদ্ধি দশা আমার। আগে কখনো মৃত্যু দেখিনি আমি। এই প্রথম। ভয়ে উদ্‌বেগে আমার হাত-পা শিঁটিয়ে কাল মেরে যাচ্ছে; মাথার ভেতরটা সব যেন ফাঁকা। ওইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে; এমন

সেই দিনই শাশুড়ির মুখে শুনলাম, 'রাক্ষুসী! তুই আমার জোয়ানমদ্দ ছেলেটাকে চিবিয়ে খেয়েছিস!'

সময়ে বাবা এলেন। আমাকে বুকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরলেন। খানিক পরে পাশে বসালেন; বাবার চোখে জল। বললেন: 'হায় রে মেয়ে! তোর কী অশেষ দুর্গতিই না ঘটালাম আমি। এখন আমি কী করি?' আমি কোনো কথা না বলে বসেই রইলাম। চারপাশে যা-সব ঘটছে, আমার মনে তা এতটুকু দাগ কাটতে পারছে না। এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিনি; আর উদ্‌বেগ দুশ্চিন্তা বলে আমার যেন কিছুই নেই। কেমন একটা অসাড় ভাব, মনে হচ্ছে এখুনি জ্ঞান হারাব। কী যে হল তার বিন্দুবিসর্গও আমার ধারণার মধ্যে নেই। কীভাবে কোথা দিয়ে যে এতটা সময় কেটে গেল—কিচ্ছুটি আমার মনে নেই।

সেই দিনই শাশুড়ির মুখে শুনলাম, 'রাক্ষুসী! তুই আমার জোয়ানমদ্দ ছেলেটাকে চিবিয়ে খেয়েছিস!' হা ভগবান! কী বলছে ওঁরা? কী করলাম আমি? আমি তো খুঁজেই পাচ্ছি না, কী অন্যায়টা আমি করলাম! বাবাকে শুধোলাম, 'বাবা, ওঁরা আমাকে এত কড়া কড়া কথা শোনাচ্ছে কেন?' বাবা বললেন, 'তুই কি মনে করিস ওরা তোকে দুষছে? দুষছে তোর কপালকে। আজই তুই বিধবা হলি। শোকে দুঃখে ওদের মাথার ঠিক নেই, তাই অমন আবোল তাবোল বকছে।' শুনে বিস্ময়ে আতঙ্কে আমি চমকে উঠলাম; নীচু গলায় ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলাম, 'তবে আমি এখন বি-ধ-বা!' এর পর আমার মুখে আর কথা জোগাল না, ডুবে গেলাম নিঃসীম নীরবতায়।

চারপাশে যা হচ্ছে সেদিকে আমার বিন্দুমাত্র মন নেই। আমার কানে বাজছে শুধু শাশুড়ির কান্না আর আর্তনাদ। তিনি একাই কেঁদে চলেছেন, পড়শি শ্যামা তাঁকে জড়িয়ে ধরে সামলাচ্ছে। পাঁচির মা-র বাবা এসেই কাঁদতে শুরু করলেন। আমার মেজো ভাশুর মরার খাট বয়ে নিয়ে শ্মশানে গেলেন মুখাগ্নি করবেন বলে। মরার পর যেসব আচার-আচরণ করতে হয় বাড়ির চাকর-বাকররা সেসবের দায়দায়িত্ব নিয়ে নিল—মাটির বাসনপত্র ভেঙে ফেলে, বিছানাপত্র বাইরে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে গোবর জলের ছড়া দিয়ে মুছে ফেলল। এসব হয়ে গেলে ওরা শাশুড়ি আর আমাকে চান করিয়ে দিল। একটা বিলাতি কম্বল পেতে তার ওপরে শাশুড়িকে শুইয়ে দিল। তিনি আমার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে করুণ সুরে গোঙাতে লাগলেন। বললেন, 'রাক্ষুসী! দূর হ আমার সামনে থেকে!' এত দুঃখেও আমি তাঁর পা জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু ঠোঁটে কোনো কথা জোগাল না।

বাবা তাঁর বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। এ-বাড়ির লোকেরা নিমগঞ্জের শ্মশানঘাটে শবদাহ করতে গেলেন। শ্মশানঘাটটা আমার বাপের বাড়ির কাছেই। দাহ হয়ে যাওয়ার পর বাবা, আমার মেজো ভাশুর, আশু ও অন্য শ্মশানসঙ্গীদের তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। ওদের তিনি নিমপাতা, বাতাসা দিয়ে দুধের শরবত আর সন্দেশ খেতে দিলেন। বাবা পূর্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে দুধ, সন্দেশ আর বাতাসা এ-বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্ণকাকা এসে শরবত বানিয়ে দুই মেয়ে আর আমাকে দিলেন। শাশুড়ি কিছুই দাঁতে কাটতে চাইলেন না; কোনোমতে খেয়েই আমরা ঘুমাতে চলে গেলাম।

শাশুড়ি আর চিৎকার করে কাঁদতে পারছেন না। তাঁর গলা ভেঙে গেছে। তিনি কম্বলের ওপর চুপচাপ মরার মতো শুয়ে আছেন। মেজো ভাশুর সন্ধ্যেয় ফিরে এলেন। মা-কে তুলে অনেক কাকুতি-মিনতি করে কোনোমতে এক গ্লাস শরবত খাওয়াতে পারলেন। সেদিন কেউ কিছু খায়নি, যে যেখানে ছিল সেখানেই শুয়ে পড়েছে। আমার বাবা সন্ধ্যেয় এলেন। মেজো ভাশুরের সঙ্গে তাঁর কী কথাবার্তা হয়েছিল, আমি তা জানি না। বাবা শাশুড়ির সঙ্গে আমাকে নিয়ে কিছু বলছিলেন। কিন্তু শাশুড়ি মানতে পারছিলেন না। ঘন ঘন মাথা নাড়াচ্ছিলেন। আমি অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিলাম, কোনো স্তোকবাক্যেই আমার কান্না বাঁধ মানছিল না। বললাম, 'বাবা, তুমি আমাকে কোথায় রেখে যাচ্ছ? আমি তোমার সঙ্গে যাব।' বাবা বললেন, 'এই অশৌচের সময় কোথাও যাওয়া ঠিক নয়; মাসখানেক পার হোক আমি এসে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। এখন আমাকে চলে যেতেই হচ্ছে। আর অত কেঁদো না তো, চেষ্টা করো শান্ত থাকতে।' বাবা চলে গেলেন। আমার সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

আমি জানি না কেন গভীর গ্লানিতে নিজের ওপর কেমন ধিক্কার জন্মে গেল। নিজের ঘর ছেড়ে বেরোতামই না। যখন আশেপাশের কেউ থাকত না কোনোমতে চানঘরে গিয়ে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে চান করে নিতাম। একঢাল চুলে ভরা মাথা আমার ভিজেই থাকত। তখন চুলে তেল দেওয়া বারণ ছিল। দশ-বারো দিন নিজের হাতে ভাত সেদ্ধ করে আমি খেয়েছি, তারপরে শাশুড়ির রান্নাঘর থেকে নিরামিষ খাবার আসত। কয়েকদিন বাদে বাড়ির আসবাবপত্র বাসন-কোসন সব নিয়ে রওনা দিলাম মেজো ভাশুরের বাড়ির দিকে।

আমার এই শৈশবে যখন আনন্দে ফুর্তিতে দিন কাটানোর কথা, তখন

কথা নেই বার্তা নেই আমার মাথায় যে আকাশ ভেঙে পড়ল, এর জন্যে কে দায়ী? কেউ না। কেউ একবারও ভাবেনি, এই মেয়েটার কী গতি হবে। কেউ আমার কাছে আসেনি, মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে। কোনোদিন খেয়েছি, কোনোদিন খাইনি। মা-বাবা বিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছেন। বালবিধবার দায় কেউ নেয় না। পরিবার-সমাজ-কারোরই কোনো মাথাব্যথা নেই বালবিধবাদের নিয়ে। একটা পয়সার দরকার পড়লেও তা আমাকে অন্যের থেকে মেগে নিতে হয়। আর স্বামীর কথা কী বলব? আমি তাঁর তিন নম্বর বউ। আর এই বিয়ে করেই এক নেহাতই বাচ্চা মেয়ের গলা কেটে নিয়েছেন—আর আমার জন্যে তিনি কী ব্যবস্থা করে গেছেন শুনি?

হিন্দু সমাজ তোমার গৌরবগাথায় ধিক, শত ধিক! একটা দশ বছরের বাচ্চা মেয়েকে পঞ্চান্ন বছরের এক বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে—বাহবা! তোমাদের কী গৌরব! ওই একরত্তি মেয়েটাকেই তার পুরো মাশুল গুণতে হচ্ছে।

হিন্দু সমাজ তোমার গৌরবগাথায় ধিক, শত ধিক! একটা দশ বছরের বাচ্চা মেয়েকে পঞ্চান্ন বছরের এক বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে—বাহবা! তোমাদের কী গৌরব! ওই একরত্তি মেয়েটাকেই তার পুরো মাশুল গুণতে হচ্ছে। যেসব মা-বাবারা নিজের কন্যার জীবনকে এমন ঊষর মরুতে পরিণত করেন, তাদের খুরে খুরে শতকোটি প্রণাম! পৃথিবীর আর কোনো দেশেই এমন উদ্ভট সমাজ আর উৎকট আচরণের দেখা মিলবে না। ভারতেই একমাত্র নারীদের এমন আখমাড়াই কলে পেষা হয়, অন্যত্র কোথাও এমনধারা রীতির চল নেই। আমি নেহাতই একটা বাচ্চা মেয়ে, আর মা-বাবা আমার এই বয়সেই আমার কোনোরকম দায়দায়িত্ব নেওয়া থেকে রেহাই পেয়ে গেছেন। এখন দু-টি অন্নের জন্যে আমাকে দাসীবাঁদি হয়ে মেজো ভাশুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। দু-মুঠো অন্নের জন্যে অন্যের খামখেয়ালমতো আমাকে দাসত্ব করতে হবে—এই কচি বয়সেই সেই বাস্তবকে মেনে নেওয়া আমাকে শিখতে হচ্ছে।

যেসব মা-বাবারা নিজের কন্যার জীবনকে এমন ঊষর মরুতে পরিণত করেন, তাদের খুরে খুরে শতকোটি প্রণাম! পৃথিবীর আর কোনো দেশেই এমন উদ্ভট সমাজ আর উৎকট আচরণের দেখা মিলবে না। ভারতেই একমাত্র নারীদের এমন আখমাড়াই কলে পেষা হয়, অন্যত্র কোথাও এমনধারা রীতির চল নেই।

শ্রাদ্ধশান্তি সব চুকে গেলে পাকশালা* থেকে আমার জন্যে মাছভাত ও অন্যান্য খাবার সকাল বিকেল আসত। অন্তত আমার পেটের জ্বালাটা কিছুটা মিটত। কয়েকদিন বাদে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আমাকে বাপের বাড়ির ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। শাশুড়ি জবাব দিলেন, খুলনায় পৌঁছোনোর পর তিনি আমাকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন। আশ্বিন মাসে খুলনা গিয়েই তিনি বাবাকে খবর পাঠালেন। বাবা আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। (চলবে)

* বাংলার সাবেক হিন্দু পরিবারে বিধবাদের, তার বয়স যাই হোক না কেন, কঠোরভাবে নিরামিষাশী হতে হয়। যে রান্নাঘরে আমিষ (মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি) রান্না হয় সেখানে বিধবাদের নিরামিষ রান্না নিষিদ্ধ। এবং সূর্যাস্তের পর কোনো রকম রান্না করা খাবার খাওয়াও নিষিদ্ধ। হৈমবতীর শ্বশুরবাড়ি তাঁর প্রতি সহমর্মী হয়ে এক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমী পা ফেলেছেন। সচরাচর এমন করুণাপরবশ আচরণ দেখা যায় না। সম্ভবত হৈমর কচি বয়সের কথা ভেবেই ওঁরা এমনটা করেছেন। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

লেখক অভিধানকার ও প্রাবন্ধিক।

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিয়ু

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজস্ট্রিট, কফি হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২
৯৮৩০৮৪৭১৫৯

প্রতিবিম্ব ও আমরা

রুমঝুম ভট্টাচার্য

অফিস যাওয়ার আগে রোজই বাড়িতে একটা হুলুস্থুলু বেঁধে যায়। এ কিছু নতুন নয়, জানে অনিমেষ। সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরোতে হলে সমস্যা তো একটু হবেই। ওই সময়েই আবার মেয়ে কোয়েলের স্কুলে যাওয়ার পুল-কার আসে। অনিমেষ—অনিমেষ সরকার একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ অফিসার। নরেন্দ্রপুরে বড়ো এক রিয়েল এস্টেট কোম্পানির থেকে ২০০০ হাজার স্কোয়ার ফুটের একটা ফ্ল্যাট কিনেছে বছর তিনেক হল। আর বেহালার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে উঠেছে সুখের সন্ধানে। এক মেয়ে আর বউ নিয়ে তার তিনজনের সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দের অভাব নেই কোনো। বউ চৈতালি সব থেকে বড়ো কাজটা করে। সংসার সামলায়। সকাল আটটার মধ্যে বর আর মেয়েকে তৈরি করে রওনা করিয়ে দেয়। চৈতালি উচ্চশিক্ষিতা হয়েও সংসারের স্বার্থে চাকরি করেনি কখনো। অনিমেষ এই স্বার্থত্যাগকে সম্মান করে মনে মনে। তাই বউকে একটু ছেড়েই রেখেছে বলা যায়। সে মোটা টাকা মাইনে পায় আর তার জন্য তার ২৪ ঘণ্টার প্রায় ১৬ ঘণ্টা কোম্পানির ঘরে বাঁধা দিয়ে রাখতে হয়েছে। মেয়ের উঁচু ক্লাস হচ্ছে। এবার নাইনে উঠবে। তার জন্যও অনিমেষের সময় নেই। ওর পড়াশোনার ব্যাপারে যাবতীয় যা কিছু সব চৈতালিই সামলায়। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর হয়তো চৈতালি সারাদিনে অনেকটা সময় পায়। কিন্তু অনিমেষ কখনো জানতে চায় না চৈতালি কীভাবে সারাদিন সময় কাটায়। কারণ তার জানার আগ্রহও নেই। অনিমেষ কোনোদিনই মেধাবী ছাত্র ছিল না। বাবা বিত্তবান মানুষ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কলকাতার এক নামি স্কুলে পড়িয়েছেন। স্কুল পাশ করার পর বি.কম. পাশ করে জানাশোনার সূত্র ধরে চাকরি। চাকরিতে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক উন্নতি কারণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে টিকে থাকার যুদ্ধে যে দক্ষতা লাগে তার সবকটিই অনিমেষের আছে। বিশেষ করে ঊর্ধ্বতনের তোষণনীতি আর অধীনস্থের দমন নীতি। যাক, আজকের অনিমেষ চল্লিশোর্ধ্ব, ছ-ফুট লম্বা, উচ্চমধ্যবিত্ত, সুখী ও স্বচ্ছল। চকচকে ফ্ল্যাট, সুন্দরী স্ত্রী ও মেয়ে, ঝকমকে সাজানো ফ্ল্যাট . . . সব নিয়ে একটা বেশ মাখো-মাখো ব্যাপার। গাড়ির সিটে গা এলিয়ে বসে শহর-ছাড়া রাস্তা বেয়ে শহরে ঢুকতে ঢুকতে একটু তন্দ্রা এসে গেল তার। হালকা হালকা মাথায় আসতে লাগল সারাদিনের জরুরি কর্মসূচি। সন্ধ্যাবেলা ফেরার সময় আজ নতুন চশমাটা ডেলিভারি নিতে হবে। চোখটায় বড্ড অসুবিধা হচ্ছে কয়েকদিন যাবৎ।

॥ ২ ॥

গরমটা খুব পড়ছে আজকাল। আগে কলকাতায় এতটা গরম পড়ত না। এসিটাও যেন কাজ করছে না ঠিক করে। গাড়ি কোন পথে যাচ্ছে ভালো বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তায় চোখ পড়তে অনিমেষ দেখল বাসস্ট্যান্ডে একটা মুখ খুব চেনা চেনা লাগছে। অজয় না? ওদের ক্লাসের চার-পাঁচজন মেধাবী ছাত্রের মধ্যে একজন। ড্রাইভারকে অনিমেষ বাসস্ট্যান্ড ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড় করাতে বলল। জানলার কাচ নামিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকল অজয়কে। এ রাস্তায় এলে সকালের দিকে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা হত আগে। ইদানীং অনেকদিন দেখেনি ওকে। অজয় ডালহৌসির দিকে কোনো একটা ছোটো অফিসে চাকরি করে। বাসের জন্য অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই। অজয় একটু ইতস্তত করে এগিয়ে এল। উফ্ এই নতুন চশমাটা এত জ্বালাচ্ছে না। সব কেমন ঝাপসা ঝাপসা। অজয় এগিয়ে এলেও মুখটা পরিষ্কার হচ্ছে না। দোকানে অবশ্য বলেছে যে নতুন চশমা প্রথম প্রথম মানিয়ে নিতে একটু অসুবিধা হবে। অজয় গাড়িতে উঠে বসেছে ওর সামনাসামনি। অজয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষের কী যে হল, ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে যেন নতুন ভাবনায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

অজয় দেখছে অনিমেষকে।

—ভালোই তো আছিস অনি, বেশ গুছিয়ে নিয়েছিস।

অস্বস্তি হচ্ছে অনিমেষের।

—কেন বলছিস অজয়?

—আর ভাই আমরা কী আর তোর মতো? মনে আছে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার কথা। সেদিন অঙ্ক পরীক্ষা ছিল। প্রথম হাফ শেষ হয়ে যেতে তুই কান্নায় ভেঙে পড়লি। ভয় হচ্ছিল বোধহয় পাশ করতে পারবি না।

অনিমেষ সংকোচে মাথা নাড়ল।

—আমরা বন্ধুরা ঠিক করলাম তোকে পরের হাফে দ্বিতীয় পেপারে হেল্প করব। আমি তোর বেঞ্চের আগের বেঞ্চেই ছিলাম। অনিমেষের অস্বস্তি বাড়ছে। নকুল সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। নিশ্চয়ই শুনল না এত কিছু।

অজয় কোন তফাতের কথা বলতে চাইছে? আজকের অনিমেষের সঙ্গে তার তফাত নাকি বহু বছর আগে ছাত্র অনিমেষের সঙ্গে তার মেধার তফাত! কেমন যেন সব গুলিযে যাচ্ছে। অফিসে নেমে গেটে দাঁড়াতেই

সিকিউরিটির লোকটি মাথায় হাত তুলে স্যালুট করল। ওর মুখটাও ঝাপসা লাগছে। চোখটা যদিও দেখা যাচ্ছে . . . আবার সেই জট পাকানো ভাবনা ঘুরে ঘুরে একটা আকৃতি নিচ্ছে . . .

—স্যার, আপনাতে আর আমাতে তফাত কোথায়?

—কী বলতে চাইছ তুমি? আস্পর্ধা তো কম নয়।

—ঠিকই তো বলছি স্যার। আপনিও তো গিয়ে এখন বসকে স্যালুট করবেন। আর আপনার ড্রাইভার সব বলেছে আমাদের। গাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে ক্লাবে গিয়ে কেমন করে আন্ডার-টেবিল পয়সা নেন, বিল তাড়াতাড়ি পাশ করার জন্য। আমার কাজ তো চোর-ধরা। তাও দেখুন, রোজ সকাল-বিকেল চোরকে দেখে স্যালুট . . .

ঘেমে চান করে যাচ্ছে অনিমেষ . . . এসব কী হচ্ছে কিছু তো বুঝছে না সে; হঠাৎ কোথা থেকে কোয়েলের গলা শুনতে পাচ্ছে . . . বাপি, বাবাই . . . অনিমেষ মুখ ফেরাতে, দেখে কোয়েল আসছে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে। কেন ওর কি স্কুলে কিছু হয়েছে? কাছে এগিয়ে আসছে মেয়ে অথচ মুখটা এখনও ঝাপসা। এই নতুন চশমাটাই যত নষ্টের গোড়া। কোয়েলের কাজলপরা দুটো মোহময় চোখ ভেসে উঠছে . . . অনিমেষের মনটা দুলে উঠছে। সন্তানস্নেহ দুর্জয়।

—বাবাই, তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো আমি জানি, তাও তোমাকে ছুঁতে পারি না।

—কেন মামন একথা বলছিস?

—জান আমার বন্ধু রিয়ার বার্থ ডে-তে ওর বাবা ওকে অ্যাপেলের ফোন কিনে দিয়েছে . . .

—আমিও দেব তোকে . . . তোর জন্যেই তো আমার সব।

—কিন্তু বাবাই ঠাম্মা আর দাদু-রও তুমি সব ছিলে।

—কী বলতে চাইছিস মামন?

—কোয়েলের দু-চোখে জল ভর্তি। টলমল করছে মুক্তোর মতো ঝরে পড়বে বলে।

—তুমি কেন ওদের ছেড়ে চলে এলে?

—তোদের আমি খুব ভালোবাসি যে। বুকের ভেতর অদ্ভুত এক টানাপোড়েন আবেগের বীণায় ভীমপল্লশ্রী রাগের কোমল নি থেকে সা হতে যেন কোমল জ্ঞা-তে গড়িয়ে পড়ছে।

॥ ৩ ॥

বিরাট বড়ো এক আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনিমেষ। চোখে সেই ঝাপসা জলছবি লেগে আছে যেন। নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে না ভালো করে। শুধু দু-চোখ রাখল প্রতিবিম্বের দু-চোখে। অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরে খুঁজতে চাইল অনিমষ সরকার-কে। অনেক অনেক প্রতিবিম্ব ভিড় করে আসছে এক এক করে। ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার অনিমেষ, অনেকের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে মনগড়া অনিমেষ . . . আর নয়। ধড়ফড় করে উঠে বসে অনিমেষ। বুকের ওপর খুলে রাখা জার্নালটা কোলের ওপর খসে পড়ে। কখন পড়তে পড়তে চোখ লেগে গেছে বুঝতেই পারেনি সে। চোখে লাগানো আজই ডেলিভারি নিয়ে আসা নতুন চশমাটা। কপালে গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। পাশের ঘরে চৈতালির গলার আওয়াজ পাচ্ছে। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকায় অনিমেষ। নতুন এক আত্মপরিচয় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে যেন সামনে। অন্যের ধারণায় জন্ম নেওয়া কল্পনার অনিমেষগুলো জুড়ে যাচ্ছে একের সঙ্গে অন্যটা। বড়ো একটা শ্বাস ছাড়ে সে। সে শ্বাস দীর্ঘশ্বাস না স্বস্তির তা বলা মুশকিল।

* * *

সামাজিকরণ (socialization) পদ্ধতির একটি অন্যতম অংশ হল বিভিন্ন সামাজিক আদান-প্রদানের (social interaction) মাধ্যমে গড়ে ওঠা ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে (self concept) গড়ে তোলা ধারণা।

আমি কী রকম তার অনেকটাই গড়ে ওঠে অন্যের আমার সম্বন্ধে কী ধারণা তার কাল্পনিক ভিত্তিতে। অন্যভাবে বলা যায় আমার আচরণও বহুলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় অন্যরা তার কী বিচার করবে সে সম্বন্ধে নিজের মনে গড়ে তোলা ধারণা থেকে। কারণ আমরা সামাজিক জীব। ব্যক্তি আমির অনেকটাই ঢেকে আছে সামাজিক পরিমণ্ডল।

এ বিষয়ে চার্লস হর্টন কুলি (Charles Horton Cooley) ১৯০২ সালে যে সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক ধারণার উল্লেখ করেছেন তা আলোচনাযোগ্য। লুকিং গ্লাস সেলফ্ (looking glass self) নামের এই ধারণা (concept) অনুযায়ী ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে ধারণা গড়ে ওঠে তার বিভিন্ন সামাজিক লেনদেনের (social interaction) সময় অন্যের তার সম্বন্ধে কী প্রত্যক্ষণ (perception) সে বিষয়ে ব্যক্তির কল্পনার ভিত্তিতে।

সহজভাবে বললে, শিশু বয়স থেকে আজীবন, সমাজের বা ব্যক্তিজীবনের বিশিষ্ট মানুষদের চোখ দিয়ে দেখা ব্যক্তি আমিকেই নিজস্ব সত্তা বলে প্রতিষ্ঠিত করি আমরা। এই লুকিং গ্লাস সেলফের তিনটি প্রধান অংশ হল—

১. আমরা কল্পনা করি অন্যের সামনে কীভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করা উচিত।
২. আমার সম্বন্ধে অন্যের প্রত্যক্ষণ কী হতে পারে সেটাও আমরা কল্পনা করে নিই।
৩. এবং ধীরে ধীরে তার ভিত্তিতে নিজস্ব সত্তা গড়ে তুলি।

আধুনিককালে আরও এক নতুন সত্তার জন্ম হয়েছে ব্যক্তির জীবনে—ভারচুয়াল সেলফ্। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে যোগাযোগ ঘটছে বিপুল সংখ্যক মানুষের সঙ্গে। একটা পোস্ট করে অন্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে সহজেই। তাছাড়া নিজেকে মনের মতো করে উপস্থাপনারও সুযোগ ঘটছে অহরহ।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা এই আত্মপরিচয় গড়ে ওঠা সম্বন্ধে কতটা সচেতন? এমন নয় তো দ্রুত ছুটতে থাকা জীবনশৈলীর সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে মনের গভীরে তৈরি হচ্ছে টানাপোড়েন। নিজেরই বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলো কোনো এক ঘুমিয়ে পড়া সন্ধ্যাতে অবচেতন মনে ছড়িয়ে দেবে আঘাত, নাড়িয়ে দেবে অন্তঃস্থ সত্তার ভিত। যেমনটা হয়েছে অনিমেষের ক্ষেত্রে। আত্মকেন্দ্রিকতার দৌড়ে ভুলে গেলে চলবে না সংকীর্ণতার গণ্ডি ভেঙে বৃহত্তর সুস্থ সমাজই পারে যথার্থ ব্যক্তিসত্তা গড়ে তুলতে, তেমনি যথার্থ ব্যক্তিসত্তাই পারে গ্লানিহীন সুশীল সমাজ স্থাপন করতে। ইতিহাস তা-ই বলে। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

লেখক মনোবিদ ও প্রাবন্ধিক।

চেনা সাপ, চিকিৎসা এক অথচ সাফল্যের মধ্যেও ব্যর্থতা: কেন?

সাপের কামড় আর তার চিকিৎসা নিয়ে গাঁ-গ্রামের মানুষজন দিশেহারা। ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা পেলে এমনকী ভয়াবহ কালাচ সাপের কামড়কেও যে মোকাবিলা করা যায় তারই কয়েকটি সত্য কাহিনি শুনিয়েছেন—**দীপক চক্রবর্তী**

সাপে কাটা আমাদের দেশের গাঁ-গ্রামে এখনও একটা বড়ো আতঙ্ক। বিশেষ করে সাপের কামড়ের চিকিৎসার ব্যাপারে। বর্তমানে চিকিৎসা-ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটলে গ্রামীণ বাংলার সর্বত্র সমানভাবে তার তেমন কোনো ছাপ পড়েনি। অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসকদের সাপে কাটার চিকিৎসার বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকার ফলে গ্রামের হাসপাতাল থেকে শহরের হাসপাতালে সাপে কাটা রোগীকে বদলি করে দেওয়া হয়। আর গ্রাম থেকে শহর এই দূরত্ব পেরিয়ে শেষমেষ রোগী যখন শহরের হাসপাতালে পৌঁছোন তখন আর কিছু করার থাকে না। অথচ আমরা জানি গ্রামের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে সাপে কাটার চিকিৎসার ওষুধ A.V.S. (অ্যান্টিভেনম সিরাম) থাকাটা বাধ্যতামূলক। বর্তমানে অনেক হাসপাতালে আছেও। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? গল্প নয় আসুন সমস্যার কারণগুলোকে কয়েকটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করি।

ঘটনা এক:

২০১৬ সালের ৩১ জুলাই ঊনিশ বছরের গৃহবধূ সোনালি ঘোষকে বিষধর কালাচ সাপ কামড়ে দেয়। অশোকনগর ভূরকুন্ডা অঞ্চলের দোগাছিয়া, গ্রামে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে রাত্রি ৮ টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে। রান্না সেরে শোবার ঘরে যাবার পথে ঘরের চৌকাঠের সামনে অজান্তে কালাচের গায়ে পা দিয়ে এই বিপত্তি ঘটান সোনালি। তিনি ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। পরিবারের লোকজনেরা এক্ষেত্রে কোনোরকম ওঝা গুণিন না করে খুব দ্রুত স্থানীয় চিকিৎসক ডা. অপর্ণা ভট্টাচার্যের পরামর্শে অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বিষয়টি whatsapp-এ Snake bite গ্রুপে খবর হওয়ায় ডা. দয়ালবন্ধু মজুমদার সাপটিকে চিহ্নিত করার জন্য আমাকেও হাসপাতালে যেতে বলেন।

কী দেখলাম:

১. কর্মরত চিকিৎসক সোনালির শরীরে বিষধর সাপের কামড়ের কোনো উপসর্গ, লক্ষণ না দেখতে পেয়ে শুধুমাত্র সাধারণ স্যালাইন চালিয়ে ভর্তি করে রেখেছেন।

২. রোগীর আত্মীয়-পরিজন মুখে বারবার কালাচ কামড়েছে বললেও কর্মরত চিকিৎসক টিটেনাস ভ্যাকসিন দেওয়া ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা শুরু করেননি।

৩. সোনালি ছয় মাসের গর্ভবতী জানতে পেরে A.V.S. চালু করারও ঝুঁকি সেই চিকিৎসক নেননি।

পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সাপটাকে তাঁরা

চিত্র ১. সাপের কামড়ে সোনালী ঘোষের পা ফোলা

চিনেছেন। এবং সঙ্গে করে নিয়েও এসেছেন। কোনোরকম ওঝা-গুণিন না করে খুব দ্রুত সরকারি হাসপাতালে সোনালিকে নিয়ে আসার জন্য পরিবারের লোকজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে মৃত সাপটিকে দেখতে চাইলাম। কিন্তু যা দেখলাম, এ তো আরও ভয়ংকর। ঘাতক সাপটিকে শুধু মেরে ফেলাই নয়, এমনভাবে সাপটিকে পোড়ানো হয়েছে তাতে করে সাপটিকে চেনা চিকিৎসকদের পক্ষে সম্ভব নয়। জানি না এরকম আনাড়ির মতো কাজ সাপে কাটার রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো উপকারে আসে কিনা! বরং এই রকম পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের আরও জটিল সমস্যায় পড়তে হয়। সাপটিকে না মেরে (পুড়িয়ে মারা তো একদমই নয়) সাপটিকে চেনা এবং জানা প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয়। জেনে রাখা প্রয়োজন এবং খুব জরুরিও বটে বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় সাপ না চিনলেও চলে। শুধুমাত্র রোগীর শারীরিক উপসর্গ, লক্ষণ দেখেই সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব। তবে সাপটিকে চেনা এবং জানা থাকলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়, কারণ নির্বিষ সাপের ক্ষেত্রে A.V.S. দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই হয় না।

সোনালির ক্ষেত্রে শেষমেশ কী করা হল

এক্ষেত্রে শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলা প্রয়োজন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগীর ইতিহাস নেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আজকের দিনে একজন আধুনিক চিকিৎসকের কাছে অজানা নয়। একেবারে গোড়াতে সঠিক ইতিহাস একজন অসুস্থ মানুষের রোগ নির্ণয়ে আধুনিক চিকিৎসকের কাছে কতটা সহজ হয়ে যায় তার প্রকৃত উদাহরণ শ্রমজীবী মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র। একজন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কর্মী হিসেবেও সাপে কাটা সমস্যা নিয়ে কাজ

করতে গিয়ে রোগীর সঠিক ইতিহাস জানা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণও পেলাম সোনালির ক্ষেত্রে।

কী সেই প্রমাণ

সোনালির পরিবারের লোকজনকে পাশা-পাশি কালাচ এবং নির্বিষ ঘরচিতি সাপের ছবি দেখিয়ে জানতে চাওয়া হল এদের মধ্যে কোন সাপটিকে মেরে তাঁরা পুড়িয়ে ফেলেছেন? সোনালিসহ পরিবারের লোকজনেরা মুখে কালাচ সাপ বললেও শেষমেষ বাস্তবে ছবি দেখে আমাদের যা দেখালেন তা হল নির্বিষ ঘরচিতি। কিন্তু সোনালির বাঁ পায়ে সামান্য হালকা দু-টি দাঁতের চিহ্ন প্রমাণ করে এটা ঘরচিতির কামড় নয়। ঘরচিতির কামড় হলে সেটা পরিষ্কারভাবে দেখা যেত,

চিত্র ২. সোনালীর কোলে সদ্যোজাত শিশু

বাঁ পায়ে সামান্য হালকা দু-টি দাঁতের চিহ্ন প্রমাণ করে এটা ঘরচিতির কামড় নয়। তাহলে সেটা পরিষ্কারভাবে দেখা যেত, এবং দাঁতের সংখ্যা দুইয়ের বেশি হত। কিন্তু কালাচের দাঁত খুবই ছোটো থাকার কারণে ক্ষতস্থানে সামান্যই দাগ থাকে, দেখে বহু ক্ষেত্রেই বোঝা যায় না এটা কালাচের কামড়।

এবং দাঁতের সংখ্যা দুইয়ের বেশি হত। কিন্তু কালাচের দাঁত খুবই ছোটো থাকার কারণে ক্ষতস্থানে সামান্যই দাগ থাকে, ও দেখে বহু ক্ষেত্রেই বোঝা যায় না এটা কালাচের কামড়। কালাচের কামড়ে খুবই অস্পষ্ট দু-টি বা একটি দাঁতের চিহ্ন লক্ষ করা যায়, আবার কোনো ক্ষেত্রে দাঁতের চিহ্ন দেখাই যায় না। সোনালির ক্ষেত্রে অবশ্য বাঁ পায়ের পাতার উপরে খুবই সামান্য হালকা দু-টি দাঁতের চিহ্ন ছিল। আর শেষ প্রমাণ হিসেবে পোড়া সাপটির লেজের দিকের পিঠের উপরের কয়েকটি না পুড়ে যাওয়া আঁশ দেখে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল সাপটি আসলে কালাচ—কালাচের আঁশ ষড়ভুজ হয়।

সোনালির ক্ষেত্রে কোনো শারীরিক উপসর্গ, লক্ষণ দেখা দেওয়ার আগেই ডা. দয়ালবন্ধু মজুমদারের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শে এবং কর্মরত চিকিৎসক ডা. সুখেন্দু রায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাত্র দশ ভয়াল A.V.S. দিয়েই সোনালিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়। সোনালি আজ ফুটফুটে একটি সন্তানের মা। এ এক বড়ো সাফল্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে।

লক্ষণ নেই তবু কেন অ্যান্টিভেনম দেওয়া হল

ফ্লোচার্ট-এর ব্যাখ্যা অনেকেই জানেন। কালাচ কামড়ালে প্রথম অবস্থাতেই কোনো উপসর্গ শারীরিক লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। যখন লক্ষণগুলো দেখা দেয়, সেগুলো এরকম:

ক. ঘুম ঘুম ভাব।

খ. দু-চোখের পাতা পড়ে আসা।

গ. দু-চোখে ঝাপসা দেখতে পাওয়া।

ঘ. মাথা ঘোরা এবং কথা জড়িয়ে যাওয়া।

ঙ. পেটে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণগুলো।

বেশ কিছু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে চিকিৎসকেরা এটা কালাচের কামড়ের লক্ষণ না বুঝতে পেরে পেটে ব্যথার চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। এ ঘটনা কলকাতার বুকেই ঘটেছে। যেহেতু সোনালি ছয় মাসের গর্ভবতী পেটে ব্যথা শুরু হলে পরের দিনের কর্মরত চিকিৎসক ভুল করে যদি একই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেন তবে তো আরও বিপদ। সত্যি কথা বলতে এ বিপদের আশঙ্কা সোনালির পরিবারের লোকজনকে বোঝানো সম্ভব হয়েছিল। যেহেতু সাপটি কালাচ এবং তা একেবারে নিশ্চিত, তখন একটু ঝুঁকি নিয়েই চিকিৎসককে এই সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়েছিল। আজ অনেকের কাছে এটা একটা নিদর্শন।

ঘটনা দুই

২০১৬-র ১৫ অক্টোবর অশোকনগর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পূর্ব মোমিনপুর নিবাসী ৮৯ বছরের বৃদ্ধাকে বিছানার মধ্যে বিষধর কালাচ কামড়ে দেয়। তাঁর নাম কুলবালা দে। লক্ষী পুজোর রাতে ছেলে বউমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে নারকেল নাড়ু পাকাচ্ছিলেন। রাত হয়েছে দেখে কুলবালা দেবীকে ঘুমিয়ে পড়তে বলা হয়। কিন্তু ওই বাড়ির কারোরই জানা ছিল না কুলবালা দেবীর বিছানায় তখন অপেক্ষা করছে রাতের এক মৃত্যুদূত।

কুলবালাদেবী ঘরের বারান্দার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লে খানিকবাদেই বলে ওঠেন তাঁর কাপড়ের ভিতর কী যেন একটা ঢুকেছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কুলবালাদেবীর বাঁ দিকের ঘাড়ে কামড় দিয়ে বসে বিষধর কালাচ। কুলবালা দেবীর চিৎকারে ঘরের থেকে তাঁর ছেলে ছুটে এসে দেখেন একটি সাপ তখনও ঘাড়ে কামড়ে ধরে আছে। এক্ষেত্রে কোনো ওঝা-গুণিন না করে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সঙ্গে অবশ্যই সাপটিকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে।

কিন্তু এক্ষেত্রে কী ঘটল

শুধুমাত্র সাধারণ স্যালাইন চালিয়ে একটি টিটেনাস ভ্যাকসিন দিয়ে ভর্তি করে রাখা হল। খানিক বাদে শারীরিক উপসর্গ দেখা দিলে পরিবারের লোকজনের অনুরোধে কর্মরত চিকিৎসক সাপটিকে দেখলেন, এবং কী বুঝলেন জানা গেল না। কিন্তু যেটা করলেন তা হল ০.২৫ মিলি অ্যাড্রেনালিন এবং ১০ ভায়াল A.V.S. চালু করতে বলে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে বদলি করে দিলেন। ব্যস, তাঁদের দায়িত্ব শেষ। কোনোরকম সর্প দংশনের বিধিসম্মত চিকিৎসা প্রণালীর নিয়ম এক্ষেত্রে মানা হল না।

ভাবুন যে হাসপাতাল থেকে একই সাপের কামড়ে সোনালি ঘোষ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, সেই হাসপাতাল থেকেই সাপ চেনা সত্ত্বেও কেন কুলবালা দেবীকে সুস্থ করে তোলা গেল না। এ কী শুধুই ব্যর্থতা নাকি দায়িত্বহীনতা? শেষ কথা এই যে কুলবালা দেবী আর জি কর হাসপাতাল থেকে বেঁচে ফেরেননি।

কুলবালা দেবীর চিৎকারে ঘরের থেকে তাঁর ছেলে ছুটে এসে দেখেন একটি সাপ তখনও ঘাড়ে কামড়ে ধরে আছে।

এ লজ্জা কার?

রাত্রি ১১টা নাগাদ ভর্তি হন কুলবালা দেবী এবং রাত ১১.৩০টা নাগাদ তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয়। অথচ এই সরকারি হাসপাতালে ৬ ফুট লম্বা ৪ ফুট চওড়া ভিনাইল বোর্ডের পোস্টার হাসপাতালের মূল গেটে ঢোকার মুখে বাঁ-দিকের দেওয়ালে পরিষ্কার লাগানো আছে। এমনকী *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় প্রকাশিত ২০১৫-১৬ ডিসেম্বর-জানুয়ারি সংখ্যার বাংলায় লেখা সর্প দংশনের বিধিসম্মত চিকিৎসা প্রণালী যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে বড়ো করে ছাপিয়ে হাসপাতালের ইনডোর, পুরুষ-বিভাগ, মহিলা বিভাগে রেখেও দেওয়া হয়, যা এখনও সুরক্ষিত আছে। তবে কেন এ মৃত্যু? যেখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে ১০০ মিনিটের মধ্যে যদি ১০০ মিলি (১০ ভায়াল) অ্যান্টিস্নেক ভেনম রোগীর শিরায় চালানো যায় তবে ১০০ শতাংশ রোগী বেঁচে যাবেন।

অথচ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এই ফেব্রুয়ারি মাসেই এই হাসপাতাল থেকেই কালাচের কামড়ে ভর্তি হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন ৩৩ বছরের এক যুবক। যাকে আর জি কর হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছিল এটা সাপের কামড় নয়, এ তো মানসিক রোগী। কী বিচিত্র চিকিৎসা-ব্যবস্থা! আসুন এই গল্পটি একটু শুনে নিয়ে শেষ করা যাক।

ঘটনা তিন

যুবকের নাম বিশ্বজিৎ রায়। থাকেন অশোকনগর পূর্বমোমিনপুর এলাকায়। ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে পরিবার মিলে একসঙ্গে বাড়িতে পিকনিক করছিলেন বিশ্বজিৎ জ্বালানির কাঠ আনতে গিয়ে মশা জাতীয় কিছুর একটা কামড় খেয়ে বসেন। কোনো গুরুত্ব না দিয়ে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুম পাচ্ছে দেখে সবার আগে ঘুমিয়েও পড়েন।

পরের দিন ৫ ফেব্রুয়ারি ঘুম থেকে উঠছে না দেখে ওর স্ত্রী ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু এ কী! এ তো চোখ মেলে তাকাতেই পারছে না। আর ঠিকমতো মাথাটা তুলতে পারছে না। শুধু ঢলে পড়ে যাচ্ছে। গতকাল রাতের সুস্থ মানুষ সকালে কী এমন হল? ব্রেন স্ট্রোক না তো! এই ভেবে পরিবারের লোকজন অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

চিত্র ৩. বিশ্বজিৎ রায়, কালাচ সাপের কামড়ের লক্ষণ

কী হয়েছিল বিশ্বজিৎ-এর

পূর্ব মোমিনপুর নামটা ইতিমধ্যেই শোনা। এখানেই থাকতেন কুলবালা দে, যিনি কালাচের কামড়ে গত অক্টোবরে মারা গিয়েছিলেন আর জি কর হাসপাতালে। পরবর্তী সময়ে ওই এলাকা থেকে দু-টি কালাচ উদ্ধারও হয়। সেখানকারই ছেলে এই বিশ্বজিৎ। পিকনিক করতে গিয়ে বুঝতেই পারেনি রাতে কালাচের কামড় খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আর কাঠ আনতে গিয়ে যাকে মশার কামড় মনে করেছিলেন সেটা আসলে মশার কামড় নয়। ওটা ছিল বিষধর কালাচের কামড়।

কী কী লক্ষণ দেখা গিয়েছিল

ক. কিছুতেই মাথা তুলে সোজা হয়ে থাকতে পারছেন না।
খ. দু-চোখের পাতা কিছুতেই মেলতে বা খুলতে পারছেন না।
গ. ঘুমে ঢলে পড়ছেন, কিছুতেই বসেও থাকতেও পারছেন না।
ঘ. মুখ দিয়ে সামান্য লালা ঝরতে থাকে।
ঙ. কথা বলতে পারছিলেন না। কথা জড়িয়ে আসছিল।
চ. ধীরে ধীরে মাথা ঘোরা শুরু হয় এবং সঙ্গে ব্যথা।

দু-চোখের পাতা ভারী হয়ে আধবোজা হয়ে থাকা মানেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় টোসিস। যা কালাচের কামড়ের প্রধান লক্ষণ। অনেক ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা নিয়েও রোগী হাসপাতালে আসেন। এক্ষেত্রে রোগীর সঠিক ইতিহাস জানা অত্যন্ত জরুরি। কেননা গ্রাম থেকে সাতসকালে কোনো রোগী যদি পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে দেখাতে আসেন তবে আগে জানা দরকার রোগী রাতে মশারি ছাড়া মেঝেতে ঘুমিয়েছিলেন কিনা। মশারিবিহীন মেঝেতে ঘুমানো মানেই কালাচের উপদ্রব এবং সাতসকালে এই পেটের ব্যথা, এটা কালাচের কামড়ের লক্ষণ।

কী করা হল

কর্মরত চিকিৎসক ডা. অপর্ণা ভট্টাচার্য এক্ষত্রে কোনো ভুল করেননি। রোগীর লক্ষণ দেখেই খুব দ্রুত ১০ ভায়াল A.V.S., দিয়ে দেওয়া হয়। এবং তা ৫০ মিনিটের মধ্যেই। রোগীর তখনও ঘুমের ঘোর পুরো কাটেনি দেখে এবং চোখের পাতাও স্বাভাবিক নয় লক্ষ করে আরও ১০ ভায়াল A.V.S.

দেওয়া হল। মোট ২০ ভায়াল দেওয়ার পর ছেলেটি একটু চোখ মেলে তাকাল এবং দেখা গেল আগের মতো ঢলে গেলেও আর পড়ে যাচ্ছে না। কিন্তু কথা তখনও স্বাভাবিক নয়। নিজে নিজে বসে থাকতে পারছেন না। অ্যাট্রোপিন ইঞ্জেকশন শিরায় দেওয়া হল। তার পর নিওস্টিগমিন দেওয়ার পর কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। দুই-তিন জনে ধরে নিয়ে গিয়ে পেচ্ছাব করিয়ে আনা হল। কিছুতেই বেডে বসে পেচ্ছাব করবেন না। তখনও ঘুমের ঘোর পুরোপুরি কাটেনি।

এর মধ্যে মুশকিলটা হল রোগীর আত্মীয়-পরিজন তখনও মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না যে এটা সাপের কামড়। মাথার একটি সিটি স্ক্যান করাতে হবে বলে শেষমেষ আর জি কর হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হল। হয়তো কর্মরত চিকিৎসক ভেবে বসতেও পারেন ২০ ভায়াল যখন হল এবং পুরোপুরি যখন স্বাভাবিক হল না তবে এটা ছোটোখাটো ব্রেন স্ট্রোক নয় তো?

চিত্র ৪. ৩০ ভায়াল এভিএস দেওয়ার পর বিশ্বজিৎ

বিজ্ঞানকর্মীর ভাবনা

এটা কোনো ব্রেন স্ট্রোক নয়। এই ভাবনা থেকেই আমার জানা কালাচের কামড়ের একটি ঘটনার কথা বললাম, ৫৩ ভায়াল লেগেছিল একজন রোগীর। তখন Snake Bite Treatment Protocol-এর গাইডলাইন ছিল না।

নতুন চিকিৎসক আসবেন তিনি কী ভেবে কী করবেন এই ভাবনা থেকে ডা. অপর্ণা ভট্টাচার্যকে পুনরায় ৫৩ ভায়ালের ইতিহাস বললাম। ওনার আন্তরিকতাকে স্যালুট জানাতেই হয়। ফের ১০ ভায়াল A.V.S. লিখে দিয়ে পরবর্তী চিকিৎসককে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বাদবাকি সময়টা যেন আমি হাসপাতালে থাকি এই বলে ডা. অপর্ণা ভট্টাচার্য চলে গেলেন। রোগীর লোকজন গাড়ি আনতে গেলেন। পরবর্তী চিকিৎসক এসে দেখলেন বিশ্বজিৎ-এর ঘুম কাটছে না। তাই দেখে পরিবারের লোকজনকে বললেন ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছে কিনা, কারণ তখনও বিশ্বজিৎ ঘুমিয়েই ছিলেন।

সিস্টার দিদি আমাকে চিনতেন। নতুন করে আবার ১০ ভায়াল A.V.S. দেওয়া শুরু হল, অর্থাৎ মোট ৩০ ভায়াল। রোগীর পরিবারকে বোঝালাম পুরো ওষুধটা দেওয়া শেষ হলে তবেই এখান থেকে নিয়ে যাবেন। এও বললাম আমার নিজস্ব কোনো পরিচিত ব্যক্তি হলে তাকে এখান থেকে বদলি করে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যেতাম না। একজন বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে বলতে পারি এটা কালাচ সাপের কামড়। আর পুরো ওষুধটি শরীরে গেলে আশা করা যায় আর কোনো সমস্যা হবে না।

না, আর কোনো সমস্যা হয়নি। গল্প হলেও সত্যি। বাকি ১০ ভায়ালসহ মোট ৩০ ভায়াল AVS দেওয়ার পর বিশ্বজিৎ নিজে থেকে উঠে বসলেন। কথা বললেন, পরিষ্কার দু-চোখ মেলে, তাকালেন। বিশ্বজিৎ সম্পূর্ণ সুস্থ তবুও দেখলাম বদলি করে দেওয়া হল। নিজে একা হেঁটে গিয়ে গাড়িতেও উঠে বসলেন, আর এরই মধ্যে কেউ যেন বলে উঠলেন ব্যাটা এটা সাপের কামড়? এটা স্ট্রোক . . .! স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির একজন কর্মী।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রস্রাবের সংক্রমণ

ডা. মৃন্ময়

আমরা দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর যে সমস্ত রোগের কবলে পড়ি তার মধ্যে প্রস্রাবের সংক্রমণ অন্যতম। বিশেষত মহিলারা এই রোগে প্রায়শই আক্রান্ত হন। দেখা গেছে প্রায় ষাট থেকে আশি শতাংশ মহিলা তাদের জীবনকালে অন্তত একবার প্রস্রাবের সংক্রমণ দ্বারা আক্রান্ত হন। অর্থাৎ প্রায় প্রতি চার জন মহিলার মধ্যে তিন জন জীবদ্দশায় অন্তত একবার প্রস্রাবের সংক্রমণ-এর শিকার হন। প্রস্রাবের সংক্রমণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে (শতকরা ৭৫-৯০ ভাগ) দায়ী জীবাণু হল ই.কোলাই (E coli) ব্যাকটিরিয়া। তাছাড়া অন্যান্য জীবাণুর মধ্যে Staphylococcus, Klebsiella, Proteus ও Enterococcus গোত্রের ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ ঘটায়।

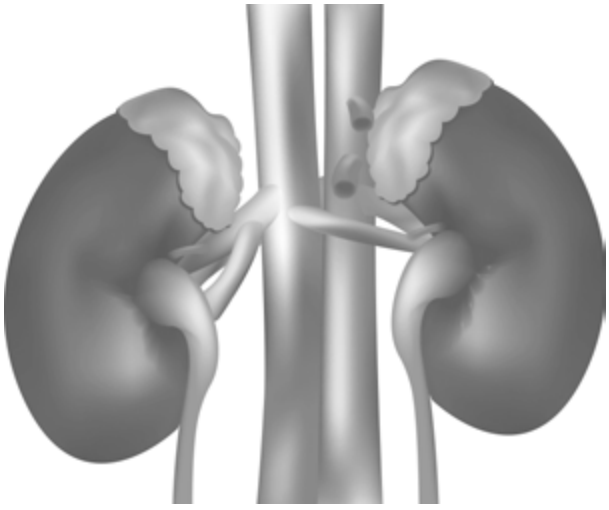

চিত্র ১. মানুষের শরীরে থাকে দু-টি কিডনি

প্রস্রাবের সংক্রমণ কি খুব সামান্য রোগ?

বেশিরভাগ প্রস্রাবের সংক্রমণ সাধারণত মূত্রনালী ও মূত্রথলির প্রদাহ রূপে প্রকাশ পায় এবং সংক্রমণ সাধারণত এই দুই অংশে সীমিত থাকে। কিন্তু সমস্যা তখনই গুরুতর হয় যখন সংক্রমণ আরও উপরে অর্থাৎ কিডনি বা পুরুষদের ক্ষেত্রে মূত্রথলির নীচে প্রস্টেট গ্রন্থিতে ছড়িয়ে পড়ে। তাই যথাসময়ে চিকিৎসা না করলে প্রস্রাবের সংক্রমণ থেকে দীর্ঘস্থায়ী কিডনির রোগ, এমনকী রক্তের সংক্রমণও ঘটতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পূর্বে এই রোগ মারণ রোগ রূপে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। হিপোক্রেটস-এর লেখাতেও প্রস্রাবের সংক্রমণ ও তার থেকে কিডনির সংক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিংশ শতকে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার অন্যান্য সংক্রামক রোগের মতো এই রোগের চিকিৎসায় আমূল পরিবর্তন এনেছে।

প্রস্রাবের সংক্রমণ কি শুধু মেয়েদের রোগ?

সাধারণত মহিলারা পুরুষদের থেকে এই রোগে বেশি আক্রান্ত হন। শারীরিক গঠনগত ফারাকের কারণে মেয়েদের মূত্রনালীর দৈর্ঘ্য পুরুষদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ হয় (মেয়েদের ৫ সেন্টিমিটার ও পুরুষদের ২০ সেন্টিমিটার)। ফলে জীবাণু মূত্রনালী দিয়ে মূত্রথলিতে সহজে ঢুকে পড়ে। তাছাড়া মহিলাদের মূত্রছিদ্র, যোনি ও পায়ুছিদ্র খুব কাছাকাছি থাকে। তাই পায়ুছিদ্র থেকে জীবাণু খুব সহজে যোনির ও প্রস্রাবের সংক্রমণ ঘটায়। ই.কোলাই ব্যাকটিরিয়া আমাদের খাদ্যনালীর নীচের দিকে বাস করে। তাই এটির দ্বারা সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে মূত্রনালী মূত্রছিদ্রের মাধ্যমে যৌনাঙ্গের পাতার মতো অঙ্গদ্বয়ের (labia) মাঝে সামনের দিকে উন্মুক্ত হয়, তাই সাদা স্রাব হলে তা থেকেও প্রস্রাবের সংক্রমণ হয়।

কিন্তু বেশি বয়সে (৫০ বা তার ঊর্ধ্বে) মহিলা ও পুরুষ উভয়ই প্রায় সমানভাবে আক্রান্ত হন। বেশি বয়সে অনেক পুরুষদের প্রস্টেট গ্রন্থি আকারে বৃদ্ধি পায়। ফলে পুরো প্রস্রাব মূত্রথলি থেকে বেরোতে পারে না।

আবার এক বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের থেকে ছেলেরা বেশি এই রোগে আক্রান্ত হয়। তার মূল কারণ ছেলেদের জন্মগত মূত্রনালীর রোগ (congenital urinary tract anomali) বেশি হয়।

কীভাবে সংক্রমণ হয়?

আমাদের রেচনতন্ত্রের কিডনির পরের অংশটা একটি জলের নালীর মতো। কিডনি থেকে মূত্রছিদ্র পর্যন্ত এর বিস্তার। কিডনির কাজ অনেকটা ছাঁকনির মতো। এখানে রক্ত পরিস্রুত হয় এবং বর্জ্য পদার্থ, নানা লবণ, যৌগ ও অতিরিক্ত জল প্রস্রাবের আকারে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। দুই কিডনি থেকে এই প্রস্রাব ইউরেটার নামক এক জোড়া নলের মাধ্যমে মূত্রথলিতে এসে জমা হয়। এই প্রক্রিয়াটি সবসময় চলতে থাকে। তাই কিডনি থেকে মূত্রথলির আগে পর্যন্ত একটি প্রবাহ বজায় থাকে। ফলে সংক্রমণ সহজে কিডনিতে ছড়িয়ে পড়ে না। অপরদিকে মূত্রথলি অনেকটা ট্যাঙ্কের মতো কাজ করে। মূত্রথলিতে প্রস্রাব সাময়িকভাবে জমা থাকে। প্রস্রাবের পরিমাণ অনেকটা হলে মূত্রথলি সংকুচিত হয় ও প্রস্রাব মূত্রনালীর মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। যেমন বদ্ধ জলাশয়ে জল দূষণ বেশি হয়, তেমনি মূত্রথলিতেও সংক্রমণ বেশি ঘটে। মূত্রথলির সংক্রমণ থেকেই কিডনি ও ইউরেটারের সংক্রমণ হতে পারে, যদি না যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা করা হয়। আলাদা করে শুধুমাত্র কিডনি ও ইউরেটারের সংক্রমণ খুব বিরল।

ব্যাকটিরিয়া প্রায়শই মূত্রনালি দিয়ে মূত্রথলিতে ঢুকে পড়ে, কিন্তু আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে যুদ্ধে সাধারণ এরা পরাজিত হয়। কিন্তু যদি খুব বেশি মাত্রায় ব্যাকটিরিয়া প্রবেশ করে কিংবা আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় তাহলে প্রস্রাবের সংক্রমণ ঘটে। প্রস্রাব করার সময় মূত্রথলি থেকে জীবাণু দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। কিন্তু কোনো কারণে যদি মূত্রথলি থেকে প্রস্রাব পুরোপুরি না বেরোতে পারে তাহলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

রক্তের সংক্রমণ থেকেও প্রস্রাবের সংক্রমণ হতে পারে কিন্তু সেটা বিরল ঘটনা।

প্রস্রাবের সংক্রমণে রোজকার চলাফেরার কিছু সাবেক রীতিনীতিই কি দায়ী?

মহিলাদের এই রোগে বেশি আক্রান্ত হওয়ার পেছনে রোজকার সমাজে চলাফেরা অনেকাংশে দায়ী। থ্রি ইডিয়টস বলুন বা পিকে বা গলির কোণ যেখানেই তাকান না কেন, দেখবেন মূত্র-বিসর্জনের ছড়াছড়ি। আরও ভালো করে বললে পুরুষদের মূত্রত্যাগের বাহুল্য সর্বত্র। তার মানে পুরুষদের কি মহিলাদের তুলনায় বেশি প্রস্রাব পায়? এরকম ব্যাখ্যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদেরও পুরুষদের মতো বাইরের কাজ করতে হয়। আর যেহেতু শৌচালয় অপর্যাপ্ত তাই সামাজিকতার দায়ে মেয়েরা অনেকক্ষণ প্রস্রাব চেপে থাকেন। অনেক মহিলারা আবার বাইরে বেরোলে সচেতনভাবে জল কম খান যাতে প্রস্রাব কম পায়।

দেওয়ালে প্রায়শই তাকালে চোখে পড়বে—'এখানে প্রস্রাব করিবেন না। প্রস্রাব করিলে ২০০ টাকা জরিমানা।' সরকারি দেওয়ালও তার থেকে বাদ যায় না। অথচ পুরুষরা ও মহিলারা উভয়ই যাতে স্বাভাবিক শৌচকর্ম করতে পারেন তার জন্য উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত শৌচালয় গড়ে তোলার কোনো প্রয়াসই নেই। যদিও-বা এক-আধটি শৌচালয় থাকে তার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

কী কী উপসর্গ হলে প্রস্রাবের সংক্রমণ হতে পারে সন্দেহ করবেন?

- সাধারণত যতবার প্রস্রাব পায় তার চাইতে বেশি বার প্রস্রাব পাওয়া।
- প্রস্রাব করার সময় জ্বালা, ব্যথা বা অস্বস্তিভাব।
- হঠাৎ-হঠাৎ করে জোর প্রস্রাব পাওয়া।
- প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত পড়া।
- জ্বর (সাধারণত ১০০.৪ ফারেনহাইট থেকে কম)।
- তলপেটে বা থাইয়ের ভিতরের দিকে বা প্রস্রাবের দ্বারের চারপাশে ব্যথা।
- পুরো প্রস্রাব হল না এমনটা অনুভূত হওয়া।

এসবের মধ্যে এক বা একাধিক উপসর্গ থাকলে প্রস্রাবের সংক্রমণ হয়েছে বলে সন্দেহ করতে হবে। এইসব উপসর্গের বাইরে অন্য গুরুতর উপসর্গ না থাকলে সংক্রমণ মূত্রনালী ও মূত্রথলিতে সীমাবদ্ধ আছে ভাবতে হবে।

কিন্তু এইসব উপসর্গের সঙ্গে যদি নীচে লেখা উপসর্গগুলো থাকে তাহলে বুঝতে হবে সংক্রমণ কিডনি ও ইউরেটারকে আক্রান্ত করেছে।

- জ্বর ১০০.৪ ফারেনহাইট-এর থেকে বেশি হলে ও তার সঙ্গে কাঁপুনি থাকলে।
- কোমরের পেছনের দিকে বা দু-পাশে ব্যথা হলে।
- রোগীর চেতনা কম (confusion) হলে।

চিত্র ২. মূত্র পরীক্ষার জন্য ঠিকভাবে মূত্র সংগ্রহ করা দরকার

কাদের প্রস্রাবের সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

- কিডনি বা ইউরেটার বা মূত্রনালীতে পাথর থাকলে।
- রেচন তন্ত্রের জন্মগত রোগ (congenital urinary tract disease) থাকলে।
- যাদের প্রস্রাবের ক্যাথেটার লাগানো থাকে।
- ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগী—মধুমেহ রোগীদের প্রস্রাবের সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের থেকে প্রায় তিন গুণ বেশি।
- নিউরোজেনিক ব্লাডার—স্ট্রোক বা সুষুম্নাকাণ্ডের রোগের ক্ষেত্রে পুরো প্রস্রাব বেরোতে পারে না। এই সমস্ত রোগীদের মূত্রথলির মাংসপেশি ঠিকমতো সংকুচিত হতে পারে না।
- যাদের শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়—এইডস, যক্ষা, ক্যান্সার-আক্রান্ত রোগী।
- যে পুরুষদের প্রস্টেট গ্রন্থি বড়ো হয়ে যায় বা প্রস্টেট গ্রন্থির সংক্রমণ হয়।
- যে পুরুষদের সুন্নত (circumcsion) হয়নি। এর কারণ হল এই যে পুরুষ লিঙ্গের ডগায় টুপির মতো অংশে (glans) ও তার বাইরের দিকের পাতলা চামড়ার পর্দা (prepuce)-তে ই. কোলাই ব্যাকটিরিয়া কলোনি তৈরি করে। এছাড়া ফাইমোসিস বা প্যারাফাইমোসিস হলে এর সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।
- যে মহিলারা প্রায়ই সাদা স্রাবে ভোগেন।
- গর্ভবতী মহিলারা—গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ইউরেটার (যে নালী কিডনি থেকে মূত্র মূত্রথলিতে নিয়ে আসে)-এর ক্রমসংকোচন ও প্রসারণ কমে যায়, ফলে প্রস্রাবের ইউরেটার দিয়ে মূত্রের গতি কমে ও সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- সদ্য বিবাহিত মহিলারা বা সদ্য যৌন সম্পর্কে মিলিত হওয়া শুরু করলে মহিলাদের প্রস্রাবের সংক্রমণ হতে পারে।
- যে মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে। ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর হরমোনের তারতম্য ঘটে। ফলে মহিলাদের যৌনাঙ্গে বসবাসকারী

স্বাভাবিক ব্যাকটিরিয়া নষ্ট হয়ে যায় আর তার জায়গা দখল করে ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়া।

- যে সব মহিলার জরায়ু আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসে—এদের প্রস্রাব মূত্রথলি থেকে পুরো বেরোতে পারে না।
- যারা প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন তাঁদেরও বেশি প্রস্রাবের সংক্রমণ হয়।

বারবার প্রস্রাবের সংক্রমণ (re-current UTI) কী?

যদি কারোর বছরে দুই বা তার অধিক উপসর্গের সঙ্গে প্রস্রাবের সংক্রমণ হয় তখন তাকে বারবার প্রস্রাবের সংক্রমণ ধরা হয়। কিন্তু সংক্রমণ যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে আবার হয় তখন তাকে ফিরে-সংক্রমণ বা relapse বলে। দেখা গেছে যেসব মহিলার একবার প্রস্রাবের সংক্রমণ হয়েছে তাঁদের মধ্যে ২০-৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে বারবার প্রস্রাবের সংক্রমণ ঘটে। যাঁদের ক্ষেত্রে প্রস্রাবের সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাঁদের সবাই বারবার প্রস্রাবের সংক্রমণ এর সম্ভাব্য শিকার। এঁদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের দ্বারা চিকিৎসা ছাড়াও যাতে বারবার প্রস্রাবের সংক্রমণ না হয় তার জন্যে অনেক সময় ৬ মাস স্বল্প মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয়। বারবার প্রস্রাবের সংক্রমণ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কী কী পরীক্ষানিরীক্ষা করা দরকার?

প্রস্রাবের রুটিন ও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। আবার অনেক সময় প্রস্রাবের কালচার পরীক্ষা করার দরকার পড়ে। মহিলাদের ক্ষেত্রে যদি পেটে বাচ্চা না থাকে বা প্রস্রাবের সংক্রমণ বার বার না হয় বা কিডনি ও ইউরেটারের সংক্রমণ এর উপসর্গ না থাকে তবে প্রথমেই কালচারের পরীক্ষা করানোর দরকার পড়ে না। আর অনেক সময় সুস্থ ব্যক্তির প্রস্রাবের রুটিন পরীক্ষায় সংক্রমণের লক্ষণ পাওয়া গেলেও যদি কোনো উপসর্গ না থাকে তাহলে কালচার পরীক্ষা বা চিকিৎসার কোনো দরকার পড়ে না।

যদি কারও বারবার প্রস্রাবের সংক্রমণ হয় বা রেচনতন্ত্রের কোনো জায়গায় পাথর হওয়ার উপসর্গ দেখা যায়, বা পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেট গ্রন্থির সমস্যার লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে আলট্রাসোনোগ্রাফি করার দরকার পড়ে। আরও কয়েকটা ক্ষেত্রে আলট্রাসোনোগ্রাফি বা অন্যান্য পরীক্ষা করতে হতে পারে।

প্রস্রাবের সংক্রমণ হলে কী করবেন?

- প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন।
- যদি জ্বর আসে কিংবা পেট, কোমর, থাইয়ের ভেতরের দিকে ব্যথা খুব বেশি হয় তাহলে প্যারাসিটামল খেতে পারেন। ওজন অনুসারে মাত্রা (ডোজ) ১৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি প্রতিবার। দিনে ৪ বার অব্দি খাওয়া যায়।
- উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে। কী অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন আর কত মাত্রায় কত দিন খেতে হবে তা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খান।

প্রস্রাবের সংক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য কী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেবেন?

বেশ কিছু সাধারণ ব্যবস্থা দৈনন্দিন জীবনে নিলে প্রস্রাবের সংক্রমণ পুরোপুরি না হলেও অনেকটা প্রতিরোধ সম্ভব। যেহেতু মহিলাদের এই রোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি তাই বেশিরভাগ প্রতিরোধ মূলত মহিলাদের নানা জীবনশৈলীর ওপর।

- পুকুরে কোমর ডুবিয়ে স্নান করবেন না বা কোমর জলে নেমে কাজ করবেন না। প্রয়োজনে জল পাড়ে তুলে স্নান বা কাজ করুন।
- বাথটবে স্নান করলে কোনো সুগন্ধ রাসায়নিক বা সুগন্ধি তরল সাবান ব্যবহার করবেন না। শাওয়ার বা বালতি-মগ এর ব্যবহার সবচেয়ে নিরাপদ।
- শৌচকর্মের সময় হাত সামনের থেকে পেছনের দিকে টানার অভ্যাস করুন। হাত পেছনের থেকে সামনের দিকে টানলে পায়খানা ও নোংরা জল যৌনাঙ্গে ও মূত্রনালিতে ঢুকে সংক্রমণ ঘটায়।
- প্রস্রাব জোর করে বেশিক্ষণ ধরে রাখবেন না।
- সাদাস্রাব হলে বারবার অন্তর্বাস পরিবর্তন করুন।
- নাইলন বা সিনথেটিকের বদলে সুতির অন্তর্বাস ব্যবহার করুন।
- যৌন মিলনের সময় কনডোম বা ডায়াফ্রাম ব্যবহার করার সময় স্পারমিসাইড (এক ধরনের জেলির মতো তরল যা শুক্রাণুকে মেরে ফেলে) ব্যবহার করবেন না বা স্পারমিসাইড যুক্ত কনডোম, ডায়াফ্রাম ব্যবহার করবেন না।
- প্রস্রাব করার পর প্রস্রাবের দ্বার পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
- যৌন মিলনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রস্রাব করুন।

প্রস্রাব করার পর প্রস্রাবের দ্বার পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

- বেশি করে জল খান।
- পায়ুগমনের মাধ্যমে যৌন মিলনের করলে অবশ্যই কনডোম ব্যবহার করুন এবং যৌন মিলনের পর যৌনাঙ্গ ভালোভাবে পরিষ্কার করুন।
- একই যৌন মিলনে পায়ুগমনের পর যোনিগমন করবেন না।
- যে রোগীদের বহুদিন ধরে ক্যাথেটার পরে থাকা প্রয়োজন তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী বেলুন ক্যাথেটারের পরিবর্তে মাঝে মাঝে সাধারণ ক্যাথেটার ব্যবহার করতে পারলে ভালো হয়। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. মৃন্ময়, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি এক ক্লিনিকের চিকিৎসক।

সরকারি চিকিৎসা বেসরকারি চিকিৎসা ও ডাক্তারের ‘লাভ’-স্টোরি

ডা. শুভাংশু পাল

দৃশ্য ১

রাজ্যের টারসিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম এক সরকারি হাসপাতালের কোনো এক ওয়ার্ডের দৃশ্য। মহিলা ওয়ার্ড, দিনের বিশেষ কিছু সময় ছাড়া পুরুষ-প্রবেশ নিষিদ্ধ। রোগিণী ভর্তি হয়েছে মাটিতে, তোশক পেতে, জরুরি কিছু টেস্ট করতে হবে। সবচেয়ে জুনিয়র যে ডাক্তার তার পদকে বলে ইন্টার্ন। সেই ইন্টার্ন একজনকে বলা হয়েছে রক্ত টেনে বাড়ির লোককে দিয়ে এখনই পাঠিয়ে দিতে।

ইন্টার্ন: এই তোমার বাড়ির লোক কোথায়?

রোগিণী: বাইরে আছে ডাক্তারবাবু।

‘‘ডাক দাও এখনই।’’

‘‘আচ্ছা আচ্ছা ডাকছি।’’

এক হাতে ফোনে বাড়ির লোককে ডাকতে ডাকতে অন্য হাতে রক্ত টানা হয়ে গেল। ওদিকে ‘বাড়ির লোক’ মহাশয় বাইরে দারোয়ানের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে এসে উপস্থিত।

‘‘এই শোনো এই রক্তটা এক নম্বর গেটের কাছে সেন্ট্রাল ল্যাবে জমা দেবে। এটা ব্লাড ব্যাঙ্কে জমা দেবে। আর এটা মাইক্রোবায়োলজিতে জমা করবে। ব্লাড ব্যাঙ্কে ১১টার আগে জমা দেবে, মাইক্রোবায়োলজিতে ২টোর মধ্যে জমা করবে।

বুঝেছ?’’, এই বলে ডাক্তারবাবু খান সাতেক একই রকম দেখতে ভায়াল হাতে ধরিয়ে দিলেন তার।

‘‘স্যার, এই ব্লাড ব্যাঙ্কটা কোথায়?’’

‘‘এখান থেকে নীচে নেমে বাঁ দিকে যাবে, একখানা চৌমাথা পড়বে, সেখান থেকে ডান দিকে পাঁচ নম্বর গেটের কাছে।’’

‘‘আর এই সেন্ট্রাল ল্যাব?’’

ধৈর্যের বাঁধটা এক সময় ভাঙে ডাক্তারের। ‘‘নেমে জিজ্ঞেস করে নেবে’’—বলে পড়ে থাকা আরও হাজারটা কাজে মন দেন তিনি।

দৃশ্য ২

বাইপাশের ধারে প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে গজিয়ে ওঠা একটা বট গাছ, মানে প্রাইভেট হাসপাতাল। ইমার্জেন্সির সামনে একখানা গাড়ি এসে থামল। একজন গাড়ি থেকে নেমে রোগীর দিকের দরজাটা খোলার আগেই গেটের হাসপাতাল কর্মী একখানা হুইল চেয়ার নিয়ে উপস্থিত। তাতে চড়ে ভেতরে ঢুকতেই কেমন একটা মন চাঙা হয়ে যায়। কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাতেও দু-মিনিট অন্তর অন্তর সাফাই চলেছে।

রোগী ইমারজেন্সি বিভাগের ভেতরে গেলেন, সঙ্গে বাড়ির একজন। বাইরে যাঁরা থেকে গেলেন, তাঁদের মধ্যে হয়তো সবাই অ-ডাক্তার, কিন্তু রোগীর সঙ্গে যদি কোনো ডাক্তারও এসে থাকেন তো তাঁর কথা শোনার কেউ নেই। অবশ্য সেটা নেহাত অকারণ নয়। সেই ডাক্তার যদি রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন, কিংবা নিদেনপক্ষে রোগী সম্পর্কে কিছু জেনে থাকেন, তো তাঁর পক্ষে ভেতরের ডাক্তারের সঙ্গে একমত হওয়া প্রায় কোনো সময় সম্ভবই নয়, অঙ্কটা সহজ। রোগীর সঙ্গী ডাক্তার চিকিৎসাবিদ্যাই কেবল জানেন। কত ইনভেস্টমেন্টে কত কাট বা কতদিন আইসিইউ ভর্তিতে ম্যানেজমেন্টের কত চাপ, সে কথা তাঁর জানবার উপায় নেই। ভেতরে একজন ডাক্তার, তাঁর পদ হল আর.এম.ও., কর্পোরেট ডাক্তারি-মইতে সবার নীচে, তিনি এই ‘খেপ খেটেই’ দিন যাপন করেন।

রোগী স্টেবল, স্থিতিশীল, তেমন বিপদ কিছু নেই, সুতরাং তিনি একদিকে পড়ে রইলেন। কিন্তু রোগীর রিপোর্ট আনস্টেবল, তাই তার ওপরে কথা হল, গম্ভীর মুখে আরও দু-চারটে পরীক্ষানিরীক্ষা হল। ডাক্তারের বিধান ‘আইসিইউ-তে ভর্তি হতে হবে।’

আর আছে ক-জন নার্স এবং গুচ্ছের ‘ম্যানেজমেন্ট’ স্টাফ। রোগী স্টেবল, স্থিতিশীল, তেমন বিপদ কিছু নেই, সুতরাং তিনি একদিকে পড়ে রইলেন। কিন্তু রোগীর রিপোর্ট আনস্টেবল, তাই তার ওপরে কথা হল, গম্ভীর মুখে আরও দু-চারটে পরীক্ষানিরীক্ষা হল। ডাক্তারের বিধান ‘আইসিইউ-তে ভর্তি হতে হবে।’ আফটার অল, রোগী ভালো থাকলেও তাঁর রিপোর্ট, কে না জানে, রোগীর চাইতে ঢের বেশি অর্থবহ।

গদ গদ হয়ে সঙ্গের লোকটি বললেন, ‘‘আমাদের কী কর্তব্য?’’

‘‘আপনি রিসেপশনে কিছু অ্যাডভান্স জমা করে দিন, আপনার কাজ আপাতত শেষ।’’

‘‘আচ্ছা নমস্কার।’’

দৃশ্য ৩

এক মেডিক্যাল কলেজের ক্যান্টিন। দু-জন ডাক্তার কথা বলছেন। দু-জনই বহুদিন ধরে কলেজের সঙ্গে যুক্ত এবং নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য।

‘‘তোমার বাবার চোখের অপারেশন কবে যেন?’’

‘‘এই তো কাল। কাল ছুটি নিচ্ছি তো তাই।’’

‘‘কোথায় হচ্ছে?’’

উত্তরে এল একটা নামকরা প্রাইভেট হাসপাতালের নাম, যদিও সেই কলেজেই চক্ষু বিভাগ পূর্ব ভারতের ‘‘রিজিওনাল ইনস্টিটিউট’’। অর্থাৎ সরকারি মাপে সবসেরা।

* * *

(পাঠক, আপনাকে আর বেশি বোঝাতে হবে না এ আমি জানি। কিন্তু সরকারি হাসপাতালে থেকে আনপড় আদমিদের বুঝিয়ে বুঝিয়ে এমন ওব্বেস হয়েছে যে চারটি কথা টিকাটিপ্পুনি না জুড়লে প্রাণে শান্তি পাব না। অতএব . . .)

প্রথম দুটো দৃশ্য হল আমাদের সরকারি আর বেসরকারি হাসপাতালের আসল পার্থক্য, আর তৃতীয়টা হল তার ফল। কোনো ডাক্তার বা সম্পন্ন ঘরের লোক আজ সরকারি হাসপাতাল থেকে মাইল খানেক দূর দিয়ে যান, এর কারণটা হয়তো এখানেই। আসলে যতই হাসিমুখে রাজ্যের সর্বোচ্চ এক্সিকিউটিভ মহোদয়া বিশাল ব্যানারে আপনাকে জানান দিন যে সরকারি হাসপাতালে সব চিকিৎসা বিনামূল্যে, আপনি নিশ্চিন্তে নিজ দায়িত্বে পাশে একখানা তারকা চিহ্ন লাগিয়ে নীচে "T & C apply" বসিয়ে নিতে পারেন। হ্যাঁ, অতি অবশ্যই চিকিৎসার বেশ কিছুটা অংশ বিনামূল্যে, এবং ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান জমানার ও মুখ্যমন্ত্রীর একজন বিরোধী হয়েও এটা মানতেই হবে, সেই অংশটা আগের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

কিন্তু আপনাকে একটা কথা বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, এই গোটা লিস্টে শেষ প্রজাতিটাই চায় আপনি সুস্থ হয়ে বাড়ি যান।

কিন্তু এবার প্রশ্ন তাহলে তুমি বিরোধিতা করছ কেন ভাই? পেশেন্টের ভালো কি তোমার পোষায় না? তা বোধহয় নয় স্যার। শুধু একখান কথা আছে। ভালোটা যে পদ্ধতিতে হচ্ছে, সেখানে গোড়ায় গলদ রয়েছে। যার ফলস্বরূপ আপনার কাছে হিরো হচ্ছেন ব্যানারের মানুষটি, হিরো হচ্ছেন সরকারি হাসপাতালের প্রশাসন, আর ভিলেন হচ্ছে 'ডাক্তার' নামের একটা প্রজাতি। কিন্তু আপনাকে একটা কথা বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, এই গোটা লিস্টে শেষ প্রজাতিটাই চায় আপনি সুস্থ হয়ে বাড়ি যান।

ইমার্জেন্সিতে আজকাল মাঝে মাঝেই শোনা যায় সব পেশেন্ট ভর্তি করতে হবে, কাউকে ফেরানো যাবে না। সেই নিয়ম মেনে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হবে মেডিসিন বিভাগে। ফ্লোরে, চলার রাস্তার ঠিক পাশে। তার এপাশে থাকবে নিউমোনিয়ার 'একখানা' রোগী, আর তার মাথার ঠিক ও পাশে মাথা দিয়ে ঘুমাবে 'একখানা' টি. বি. রোগী—জাতি-ধর্ম-বর্ণের পাশাপাশি কনজেনিটাল-ইনফেক্টিভ-ইনফ্লামেটোরি-নিওপ্লাস্টিক নির্বিশেষে সব রোগের 'মানুষ' ভাগ করে নেবে 'মাটি।' তাই ডেঙ্গু রোগী, যে হয়তো বাড়িতে জল আর প্যারাসিটামল খেয়ে সারত, সে হয়তো ফিরে আসবে এম.ডি.আর.টি.বি. (বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা) নিয়ে, যার আসলে কোনো ঠিকঠাক চিকিৎসাই নেই।

আরও দু-চারখান কথা বলি। এরপর আপনার মূত্র পরীক্ষার নমুনা জমা হবে ১০টা অব্দি, আই.সি.টি.সি. রক্ত জমা হবে ১১টা অব্দি, হেপাটাইটিস পরীক্ষা হবে ২টো অব্দি, তাও তিনটে পরীক্ষা হাসপাতাল চত্বরের তিন প্রান্তে। সরকারি হাসপাতালে একমাত্র ডাক্তার বাদে সবার 'দিন-ক্ষণ মাপা আছে, বরাতে ছাপা আছে'। এই সময়ের বাইরে কোনো পরীক্ষা তাড়াতাড়ি দরকার হলে সেটা আর 'ফ্রি' থাকবে না, বুঝতেই পারছেন। দোষটা কিন্তু কখনোই ওই লোকগুলোর নয়, যারা এই পরীক্ষাগুলো করছেন—আপনাদের নির্বাচিত 'ব্যানারের মানুষ' ওদের এর বেশি কাজ করার লোকই দিতে পারেননি এখনও। তাই আজকের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট হয়তো আসবে দু-দিন পেরিয়ে—হোক না ধুঁকতে থাকা সার্ভিস, কিন্তু 'ফ্রি' তো বটে।

ভর্তি হল, পরীক্ষাও হল, এবার চিকিৎসার পালা। কলকাতার অগ্রণী হাসপাতালগুলোতেও সুপার-স্পেশালিটি বিভাগগুলো 'মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি'। ইমার্জেন্সির জন্যে আপনাকে হয় ছুটতে হবে পি.জি.-তে নয়, বাইপাসে। হার্ট অ্যাটাকের রোগীর জন্যে বেড পাবেন না হয়তো মোক্ষম সময়ে। তাই সকালে উঠে 'হ্যাঁচ্চো'র চিকিৎসা যতটা 'ফ্রি', বাকিটা কিন্তু ততটা নয়। আবার ধরুন আপনার রোগীর অবস্থা চিকিৎসার মাঝপথেই খারাপ হয়ে গেছে, হাসপাতালের মাত্র ১২খানা সি.সি.ইউ বেডের একটার দাবিদার হিসেবে তার নাম উঠবে হয়তো খান-পঞ্চাশ নামের পেছনে। কিন্তু ওদিকে ব্যানারের মানুষদের চিঠি বা ফোন নিয়ে আসা 'ক্যাচ" রোগীরা ওই বেডেই স্থান করে নেবেন সিরিয়ালে নাম-ধাম ছাড়াই।

আপনি হয়তো জানেন না আপনাকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠানোর সময় একজন ডাক্তারের মনে কী চলে আর দুর্ভাগ্যবশত না সেটা টাকা দিয়ে কেনা যায়, না সেটা বাইরে থেকে বোঝা যায়—আর এই অভিজ্ঞতাটার জন্যেই কিন্তু একজন ডাক্তারের এই পেশায় আসা।

যাই হোক, এই বৃত্তান্ত বলতে থাকলে বক্তব্য দীর্ঘায়িত হয়েই চলবে। মূল কথাটা হচ্ছে আজ স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতালের এই দাপট একটাই কারণে যে সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা জিও সিমের মতোই—ফ্রি হতে পারে, কিন্তু তার নিশ্চয়তা কিছু নেই। এর জন্যে দায়ী আমরা, ডাক্তার ও ডাক্তারির সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা—কিন্তু আপনাদের দায়িত্বও একেবারে কম নয়। আমাদের দোষ আমরা সব জেনে-বুঝেও নীরব আছি, আপনাদের দোষ আপনারা বুঝেও বুঝতে পারছেন না। আর এর ফাঁকে নেপোয় মারছে দই। আপনি হয়তো ভাবছেন, আপনাকে সাহায্য করে ডাক্তারের কী লাভ! সে তো টাকার কাঙাল! কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না আপনাকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠানোর সময় একজন ডাক্তারের মনে কী চলে আর দুর্ভাগ্যবশত না সেটা টাকা দিয়ে কেনা যায়, না সেটা বাইরে থেকে বোঝা যায়—আর এই অভিজ্ঞতাটার জন্যেই কিন্তু একজন ডাক্তারের এই পেশায় আসা।

ইতি,

আপনাকে সাহায্য করে ডাক্তারের কী লাভ, সেটা আপনাকে বোঝাতে অপারগ এক অর্বাচীন (মেডিক্যাল ছাত্র)। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. শুভাংশু পাল, এমবিবিএস, একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ডাক্তার।

হাইপারভেন্টিলেশন কিংবা অ-কারণ শ্বাসকষ্ট

হাঁপানি রোগীর শ্বাসকষ্ট আমাদের পরিচিত। হৃদ্‌যন্ত্রের গোলযোগে শ্বাসকষ্ট হয়, সেটাও আমরা জানি। এছাড়া শারীরিক আরও কিছু বিরল কারণে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। কিন্তু শরীর ঠিক আছে, 'মনের ভুলে' শ্বাসকষ্ট? যাঃ তাই আবার হয় নাকি? হয়, হয়, আর সেটা চিনতে গেলে চাই ক্লিনিক্যাল দক্ষতা, কোনো বড়োমাপের পরীক্ষানিরীক্ষা নয়—জানাচ্ছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী।**

শ্বাসকষ্টের কারণের বিধিবদ্ধ সীমারেখা টানা কঠিন। হার্টের পাম্প করার ক্ষমতার অভাবে বা ফুসফুসের রোগে শ্বাসকষ্ট হয়, আবার এমন ক্ষেত্রেও শাসকষ্টের অনুভূতি হয় যেখানে যুতসই শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা দেওয়া ভার। হার্টের বা ফুসফুসের রোগে শ্বাসকষ্ট হলে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা সেটার কার্যকারণ খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে এরকম শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ভিত্তিক ব্যাখ্যা যথেষ্ট হয় না।

শ্বাসকষ্টের অনুভূতি আদতে একটি সংবেদনশীল মস্তিষ্কের জটিল ক্রিয়ার এক অনুভূতি, যে অনুভূতি ভুক্তভোগী মানুষটির পরিমণ্ডলের উপরে নির্ভরশীল। শ্বাসকষ্ট বা এই রকমের কষ্টের বিবরণ রোগীই কি ভালো করে দিতে পারেন? বুকের ব্যথা, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট, বুক ভারী বা হালকা হয়ে যাওয়া—এমন সব বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে রোগী বা রোগিণী যেটা বোঝাতে চান, সেটা তো তার কাছেও সঠিক বোঝাতে না পারার জন্য আরেক কষ্টকর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ডাক্তার অনেক সময়ে রোগীর রোগ বিবরণের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পান না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে এই ধরনের শ্বাসকষ্ট নিয়ে রোগী পৌঁছোলে তাঁদের শ্বাসকষ্টের কারণ খুঁজতে ডাক্তার গলদঘর্ম হয়ে যান। প্রথাগত প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষায় রোগের কারণের টিকিটির নাগাল পান না। এমনি এক রোগিণীর কথা আমরা শুনব এই সত্য কাহিনিতে। রোগিনীর নাম যে কল্পিত সেটা বলাই বাহুল্য।

কাহিনির ভূমিকা হিসেবে এ কথাটা প্রাসঙ্গিক যে মানুষের অনুভূতি আর অনুভবের পার্থক্য আছে। প্রথমটা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুর উত্তেজনার ফল আর দ্বিতীয়টা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত চেতনার ফলে আমাদের প্রতিক্রিয়া মাত্র। শ্বাস নেবার প্রক্রিয়াটা মস্তিষ্কের যে অঞ্চল থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় তার নাম ''রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম''।[১-৩] এবারে কাহিনিতে ঢুকে পড়া যাক।

* * *

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর তৃষার মা বেশ চিন্তিতভাবেই বললেন, এবার ডাক্তার না দেখালেই নয়। মেয়ের শ্বাসকষ্ট আজ বেশ বাড়াবাড়ি রকমের হচ্ছে। স্কুল থেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। সামনের সপ্তাহেই ওর পরীক্ষা। কী যে হবে!

ক্লাস ইলেভেনে ভর্তি হবার সময় তৃষার বাবা স্কুল পালটিয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করেছেন। এই নতুন স্কুলের নামডাক বেশি। তৃষার আপত্তিকে পাত্তা দেবার প্রয়োজন মনে করেননি ওর বাবা। এই সব ব্যাপারে তৃষা বা তৃষার মায়ের মতামতের মূল্য আছে বলে তার বাবা মনে করেন না।

মেয়ের ঘরে উঁকি মেরে বাবা দেখলেন তৃষা পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তেমন কোনো কষ্ট হচ্ছে বলে বোঝাই যায় না। এ আবার কী রোগ রে বাবা! তৃষার ঠাকুরদার শ্বাসের ব্যামো ছিল। বিড়ি-খাওয়া-রোগ। রোজ সন্ধ্যে হলেই কাশির দমক বাড়ত। বড়ি বা ইনহেলার না নিলে শ্বাসকষ্ট কমত না। তিনি তো এমন শুয়ে থাকতে পারতেন না! নিজের বুদ্ধি আর যুক্তি দিয়ে তৃষার বাবা মেয়ের শ্বাসকষ্টের কারণ বোঝার চেষ্টা করলেন।

আমাদের ব্যথা, বেদনা, বা ভাষায় প্রকাশ করতে না পারা অন্যান্য কষ্টের উদ্রেক হলে আমাদের সামাজিক ধারণা আর গুজবের সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশী, খবরের কাগজ, টেলিভিশন, মায় রাস্তার বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং ইত্যাদি থেকে পাওয়া জ্ঞান আমাদের পরবর্তী কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। শারীরিক কষ্টের মধ্যে শ্বাসকষ্ট বেশ হতবুদ্ধি করে দেয়। প্রথমেই মনে পড়ে হার্টের রোগ আর হাঁপানি রোগের কথা। এটা ভাবার সঙ্গত কারণও আছে। ওই রোগগুলোকেই আমরা সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। তৃষার বাবা-মাও এই রকমের দুর্ভাবনায় পড়লেন।

তৃষা স্কুলে যাচ্ছিল না বেশ কয়েকদিন ধরেই। সামনেই পরীক্ষা। আর অবজ্ঞা করা যাচ্ছে না। শেষমেশ তৃষাকে নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে পৌঁছে গেলেন তৃষার বাবা আর মা। ডাক্তার প্রবীণ ও বিচক্ষণ। তৃষাকে জন্মাতে দেখেছেন। জানতেন ওর শ্বাসের রোগ ছিল না। তৃষাকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে একান্তে তৃষার বাবা ও মা-কে বললেন, তৃষার রোগটা ওর মনে, শরীরে নয়। রোগের গালভরা নাম, ''হাইপারভেন্টিলেশন সিন্ড্রোম''। তৃষার মা চেয়ার থেকে উলটে পড়েই যাচ্ছিলেন প্রায়। তৃষার বাবা ধরে

ফেললেন। ডাক্তার অভয় দিলেন, রোগের নামটা খটোমটো হলেও আসলে এতে ভয়ের কিছু নেই। এটাকে ঠিক শরীরের রোগও বলা যাবে না। তৃষার মা চোখ বড়ো বড়ো করলেন, আর ওর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, সেটা আবার কেমন রোগ? আর সারার উপায়ই বা কী?

একটু দম নিয়ে ডাক্তারবাবু বলতে শুরু করলেন শ্বাসকষ্টের সাতকাহন।

শ্বাসকষ্টের সাতকাহন

আমাদের শরীরের চাহিদা অনুযায়ী আমরা শ্বাস নিই। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় বা দৌড়ানোর সময়ে আমাদের শরীরের বেশি অক্সিজেন লাগে আর বেশি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড শ্বাসের সঙ্গে ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শরীরের মধ্যেকার অসংখ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুযায়ী এই শ্বাসের বাড়া কমা নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে মস্তিষ্কের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের শ্বাস নেওয়া আর ছাড়ার প্রক্রিয়াটি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যাতে আমাদের রক্তের অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন আয়নের (অ্যাসিড-বেস) মাত্রা স্বাভাবিক থাকে। খেয়াল করে দেখবেন, জোর করে কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে থাকলে কষ্ট হয়। আসলে এটা শরীরের সেফটি ভালভ। প্রয়োজনের তুলনায় শ্বাস নেওয়া কম হওয়ার জন্য রক্তের কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বেড়ে গেলে শরীরের ক্ষতি। তাই কষ্টবোধ, যাতে আমরা ইচ্ছে করে শ্বাস বন্ধ করে না থাকি। অন্যদিকে, নানা রোগে রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়, সেখানেও শ্বাসকষ্টের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। উদ্দেশ্যটা শেষ বিচারে একই—এমন অবস্থাতেও আমরা বেশি চেষ্টা করে, হাঁপিয়ে, শ্বাস নিই, যতটা সম্ভব বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড শরীর থেকে বের করে দিই আর অক্সিজেন ঢুকিয়ে নিই শরীরে।

হার্টের রোগে যখন হৃদ্‌পেশির পাম্প করার ক্ষমতা কমে যায় তখন ফুসফুসে রক্ত জমে গিয়ে ফুসফুসকে অনমনীয় করে তোলে। শ্বাস নেবার প্রচেষ্টা স্বাভাবিক-মাত্রায় থাকলে শরীরে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়বে আর অক্সিজেন কমবে—তাই আমরা বেশি চেষ্টা করে, হাঁপিয়ে, শ্বাস নিই, আর ডাক্তার বলেন আমাদের 'কার্ডিয়াক অ্যাজমা' বা 'হার্টের রোগজনিত হাঁপানি' হয়েছে। সাধারণ হাঁপানি রোগে ফুসফুসে হাওয়া ঢোকা বেরোনোর পাইপ (ব্রঙ্কিওল) সরু হয়ে যাওয়ার জন্য জোরে জোরে শ্বাস নিতে হয়। এই সব অবস্থাগুলো শ্বাসকষ্টের অনুভূতি উদ্রেক করে।

আবার, শ্বাসযন্ত্রের কোনো সমস্যা না থাকলেও হৃদ্‌পিণ্ডে প্রয়োজনের চেয়ে কম রক্ত প্রবাহ হলে (ইস্কিমিক হার্ট ডিজিস) বুকের ব্যথা অনেক সময়ে শ্বাসকষ্ট বলে অনুভূত হয়। এ ছাড়া বুকের খাঁচার রোগে (কুঁজো হওয়ার রোগ) বা ফুসফুসের চারধারে জলীয় পদার্থ বা হাওয়া জমে যাওয়ার জন্যও (pleural effusion and pneumothorax) বুক ফোলানোর প্রক্রিয়া বেশি কঠিন হয়ে যায়, ফলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এছাড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাংসপেশিতে রক্ত সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার ফলে ও আরও অনেক অল্প-জানা কারণে শ্বাসকষ্টের অনুভূতি হতে পারে। জ্বরসহ বেশ কিছু শারীরিক রোগেও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির বিপাক বা মেটাবলিজম বেড়ে যাওয়ার জন্য শরীরে বেশি অক্সিজেন দরকার হয়, বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দিতে হয়; তখনও নিশ্বাসের হার আপনা-আপনি বেড়ে যায়, বেশি বেড়ে গেলে শ্বাসকষ্টও হতে পারে। তবে শরীরের শ্বাসব্যবস্থার নানা অংশের 'ট্রেনিং'-ও চাই, 'ট্রেনিং' ছাড়া কাজ করতে গেলে কষ্ট হতে পারে। নিয়মিত যথাযথ শারীরিক শ্রম না করলে সম্পূর্ণ সুস্থ শ্বসনযন্ত্র অল্প পরিশ্রমে তার কর্মক্ষমতার ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছে যায়—সেই শ্বাসকষ্টের কারণকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ''ফিজিক্যাল ডিকন্ডিশনিং''। এটা মনে করা হয়, জোরে জোরে শ্বাস নেবার সময় আমাদের বুকের খাঁচার মাংসপেশির মধ্যেকার এক ধরনের স্নায়ুর উত্তেজনা মস্তিষ্কে শ্বাসকষ্ট অনুভূতির সংবেদন বয়ে নিয়ে যায়।

তৃষার এই সব কোনো শারীরিক রোগই নেই। তৃষার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কেন ওর এই কষ্ট হচ্ছে, ডাক্তারবাবু?

তৃষার রোগ

ডাক্তারবাবু বলতে থাকলেন, হাইপারভেন্টিলেশন সিন্ড্রোম-এর কারণটা যদিও খুব স্পষ্ট নয়, তবে বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এটার সঙ্গে উৎকণ্ঠা আর এক ধরনের ভয় পাওয়ার রোগের (প্যানিক ডিসঅর্ডারের), সম্পর্ক আছে। সেই অর্থে এটা মনের রোগ। এই ক্ষেত্রে শারীরিক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি করে শ্বাস নেওয়ার জন্য রক্তের কার্বন ডাইঅক্সাইড শ্বাসের সঙ্গে অত্যধিক মাত্রায় বেরিয়ে যায়। রক্তে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্তের অম্লতা বাড়ায়। এই রোগে ঘন ঘন শ্বাস নেবার কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে যায়। ফলে রক্তের আপেক্ষিক ক্ষারের (সোডিয়াম বাইকার্বোনেট) মাত্রা অম্লের তুলনায় বেড়ে যায়—একে বলে শ্বসনজনিত ক্ষারবৃদ্ধি (রেস্পিরেটরি অ্যালকালোসিস)। এটা হাইপারভেন্টিলেশন সিন্ড্রোম-এর বৈশিষ্ট্য। শারীরিক কারণের রোগে যখন রোগী হাঁপের টানে ভুগবে, তাদের রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইড কমবে না, বরং যদি হাঁপানির কষ্টকর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ফুসফুসে যথেষ্ট বাতাস যেতে না পারে তো রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাবে।

শ্বাসকষ্টের সঙ্গে সঙ্গে অল্পবিস্তর হাতে পায়ে অসাড় ও ঝিনঝিন ভাব, বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড়, হঠাৎ ঘেমে ওঠা, হাত ও পায়ে এক ধরনের খিঁচুনির অনুভূতি আর মাথায় কষ্ট হওয়াটা বিরল নয়। তবে এই সব কষ্টের জন্য অন্য কোনো শারীরিক রোগ দায়ী কিনা সেটা আমাকে খুঁজে দেখতে হবে।

'কী জানি বাবা, এসব সায়েন্সের কথা, আমি কি আর বুঝব?'—এমন ভেবে একাদশ শ্রেণির কলা বিভাগের ছাত্রী তৃষা প্রথমে একটু গুটিয়ে ছিল। এবার সে-ও মুখ খুলল, বলল, 'ডাক্তারবাবু আমি আরও জানতে চাই।' রোগী আরও জানতে চায়, আর এই জানানোটাই এই অসুস্থতার সবচেয়ে কার্যকারী চিকিৎসা। ডাক্তার বলতে লাগলেন, তোমার এই সমস্যাটার সঙ্গে উৎকণ্ঠা বা কোনো বিষয়ে ভয় পাওয়ার একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। দেখা গেছে, উৎকণ্ঠা আর ভয় পেলে প্রায় ২৫ থেকে ৮৩ শতাংশ ক্ষেত্রে এক ধরনের শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয় যার কোনো শারীরিক কারণ খুঁজে পাওয়া

যায় না।[৪-১০] এ ছাড়াও মানসিক কোনো সমস্যা নেই এমন ১১ শতাংশ ক্ষেত্রে শারীরিক কারণ ছাড়াই শ্বাসের এক ধরনের কষ্ট হয়।[১১] আক্রান্ত ব্যক্তি ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে, রোগী ও তার পরিজনরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দেখা গেছে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে এই সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হন।[৬-১১] সেটা মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থানের জন্যও হতে পারে।

এমন সময়ে তৃষা বলে উঠল, ডাক্তারবাবু, আমার মাথাটাও কেমন হালকা হালকা লাগে, আর হাতে পায়ে ঝিনঝিন করে, হাত-পায়ের পেশিতে টানও ধরে। ডাক্তার বলেন, হ্যাঁ। শ্বাসকষ্টের সঙ্গে সঙ্গে অল্পবিস্তর হাতে পায়ে অসাড় ও ঝিনঝিন ভাব, বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড়, হঠাৎ ঘেমে ওঠা, হাত ও পায়ে এক ধরনের খিঁচুনির অনুভূতি আর মাথায় কষ্ট হওয়াটা বিরল নয়। তবে এই সব কষ্টের জন্য অন্য কোনো শারীরিক রোগ দায়ী কিনা সেটা আমাকে খুঁজে দেখতে হবে। আমি সেটাই করেছি। সেরকম কোনো রোগ তোমার নেই। আর তুমিও একটু ভাবলেই বুঝবে, তোমার শ্বাসকষ্টটা শারীরিক কারণে শ্বাসকষ্টের চাইতে অন্য স্বভাবের। যেমন ধরো, শারীরিক পরিশ্রম করলে শারীরিক কারণের শ্বাসকষ্ট বাড়ে, তোমার ক্ষেত্রে কিন্তু তা হচ্ছে না। তোমার মা বলেছেন, তুমি যখন শুয়ে থাকো, আর কেউ না কেউ তোমার কাছাকাছি থাকে, তখনই তোমার শ্বাসকষ্ট বেশি হয়। তোমার মা উঁকি দিয়ে দূর থেকে তোমাকে যখন দেখেছেন, তখন তোমার এমন কষ্ট হতে উনি দেখেননি। মনোবিদরা বলেন, এমন ক্ষেত্রে অবচেতনে এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে আশেপাশের আত্মীয়পরিজনদের মনোযোগ আকর্ষণের একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তুমি ইচ্ছে করে, মা-বাবাকে দেখানোর জন্য, হাঁপিয়ে ওঠার ভান করছ, তা কিন্তু নয়।

তৃষার বাবা মন দিয়ে শুনছিলেন। এবারে তাঁর উদ্বিগ্ন প্রশ্ন। ডাক্তারবাবু আমার বাবার হাঁপানি রোগ ছিল। তার মতোই তো ওর কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার তৃষার বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, শারীরিক রোগের শ্বাসকষ্টের সঙ্গে এই শ্বাসকষ্টের এই রোগের ফারাকটা কী করে বুঝলাম সেটা বলছি। আসলে এই রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়াটা অন্য শারীরিক রোগের কারণগুলি বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ার অন্তিম ফল। সেটা কেমন? আপনারা সবাই মন দিয়ে শুনুন। শ্বাসকষ্টের শারীরিক কারণের একটা গতে বাঁধা ধরন থাকে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিছু কিছু জানা কারণে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, আর কখন শ্বাসকষ্ট হতে পারে সেটাও আগেভাগে কিছুটা অনুমান করা যায়। যেমন—পরিশ্রম করলে হার্টের রোগের ও হাঁপানির শ্বাসকষ্ট বাড়ে। আবার হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা কমে যাওয়ার রোগে (হার্ট ফেলিয়োর) মাঝরাতে শুয়ে থাকা অবস্থায় শ্বাস কষ্ট হয়। এই রোগগুলির প্রতিটির সঙ্গে সঙ্গে আবার আনুষঙ্গিক কাশি বা অন্যান্য রোগলক্ষণও থাকে। অথচ দেখুন, শারীরিক পরীক্ষার সময়ে তৃষার হার্ট আর ফুসফুস স্বাভাবিক দেখতে পেয়েছি। এটা আমার রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। আর একটা বিষয় আমাকে নিঃসন্দেহ করেছে। সেটা হল, তৃষাকে যখন পরীক্ষা করছিলাম, আমার নজর এড়ায়নি যে ওর প্রতিটি শ্বাসে হাওয়া টানার ক্ষমতা খুব অল্প ছিল। শারীরিক রোগে এমন হয় না। শারীরিক রোগে তো বেশি করে শ্বাস টানার প্রয়োজনটা দৈহিক, যেটার কঠোর নির্দেশ মস্তিষ্ক থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। তৃষার শারীরিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘন ঘন শ্বাস টানার চেষ্টা ওই মস্তিষ্কই স্তিমিত করে রাখে। ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকলে রক্তের কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে গিয়ে শ্বাস নেওয়ার সময়ে হাওয়া টানার পরিমাণে রাশ টানতে বাধ্য করে। অর্থাৎ কষ্টের সময়ে তৃষা যখন ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিল, ক্রমে ওর অবচেতনেই প্রতিটি শ্বাসে হাওয়া টানার পরিমাণ কমে যাচ্ছিল। এই রকমটি কোনো শারীরিক রোগের কারণে হবার নয়। হাতে পায়ে ঝিনঝিন অনুভূতি আর হাত পায়ের পেশির খিঁচুনি রক্তের কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে যাওয়ারই ফলশ্রুতি। আর একটা বোধহয় আপনাদের নজর এড়িয়ে গেছে, কাজকর্ম করার সময়ে বা অন্য কোনো শারীরিক পরিশ্রম করার সময়ে তৃষার শ্বাসকষ্ট তেমন করে বেড়ে যাচ্ছে না। এটাও কোনো শারীরিক কারণের শ্বাসকষ্টের রোগে হবার কথা নয়। অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রমের তীব্রতা সঙ্গে শারীরিক কারণের শ্বাসকষ্টের রোগের কষ্টের একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে, যেটা ওর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

এই পর্যন্ত শুনে তৃষা কী বুঝল সেটা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও মনে হল ডাক্তারের এই কথোপকথন তৃষার বাবা ও মা-কে আশ্বস্ত করতে পারল। এমন ক্ষেত্রে রোগীর পক্ষে রোগের ইতিবৃত্ত বোঝা অনেক সময়ে সম্ভব হয় না। বিচক্ষণ ডাক্তার জানেন, এই রোগে পরিবারের সহমর্মিতা চিকিৎসার বড়ো সহায় হয়। তৃষার বাবা আর মা-কে বললেন সে কথা। আরও বললেন, তৃষার রোগে রোগীকে রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারটা যতটা সম্ভব বুঝিয়ে বলা চিকিৎসার অঙ্গ। তৃষার শ্বাসকষ্টের কারণ হিসাবে এই রোগের অস্তিত্বের ব্যাপারে আপনাদের নিশ্চিত করা দরকার। আসলে এই রোগের কারণের তো কোনো সহজলভ্য নির্ণায়ক পরীক্ষানিরীক্ষা হয় না। অন্য কোনো শারীরিক রোগ নেই এটাই কেবল নিশ্চিত হতে হয়। শারীরিক রোগ সম্ভাবনা নির্মূল করার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে আমি দু-একটা কথা বললে আপনারা আমার ওপরে ভরসা রাখতে পারবেন।

ডাক্তার বলতে থাকলেন 'এই সমস্যার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, রোগী মনে করে সে পুরোপুরি শ্বাস নিতে পারছে না, একটা অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে। সে বড়ো বড়ো শ্বাস নিতে পারছে না। শ্বাস নেবার শরীরের আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ লম্বা ও গভীর শ্বাস নিতে দিচ্ছে না। মাঝেমধ্যে, শারীরিক পরিশ্রম

এই সমস্যার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, রোগী মনে করে সে পুরোপুরি শ্বাস নিতে পারছে না, একটা অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে। সে বড়ো বড়ো শ্বাস নিতে পারছে না। শ্বাস নেবার শরীরের আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ লম্বা ও গভীর শ্বাস নিতে দিচ্ছে না। মাঝেমধ্যে, শারীরিক পরিশ্রম ছাড়াই ঘন ঘন কিন্তু ছোটো ছোটো শ্বাস নেওয়ার প্রচেষ্টাটা এই রোগের বৈশিষ্ট্য।

ছাড়াই ঘন ঘন কিন্তু ছোটো ছোটো শ্বাস নেওয়ার প্রচেষ্টাটা এই রোগের বৈশিষ্ট্য। মনে করে দেখুন, আপনার বাবার হাঁপানির রোগ ছিল। তাঁর শ্বাসকষ্ট হবার কিছু কিছু পারিপার্শ্বিক ও বোধগম্য কারণ থাকত, তিনি নিজেই বুঝতে পারতেন, এবার ধুলো বেশি, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, বা ঠান্ডা লেগেছে, শ্বাসকষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশি। তৃষার শ্বাসকষ্টের কিন্তু অমন

কারণ কিছু নেই। আপনারা লক্ষ করেছেন, শারীরিক পরিশ্রমে তৃষার শ্বাসকষ্ট তেমন বাড়ে না। বরং খেলাধুলা করার সময়ে বা ওর বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে সময় কাটানোর সময়ে ও ভালো থাকে। এটা আমাকে রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। আপনাদের বোধহয় মনে আছে তৃষার ঠাকুরদার কথা। উনি কি পরিশ্রম করার সময়ে শ্বাসকষ্ট থেকে আরাম পেতেন? নিশ্চয়ই না। তৃষা কাজকর্মে ডুবে থাকলে আর শারীরিক পরিশ্রম করার সময়ে অপেক্ষাকৃতভাবে ভালো থাকে—এটাই ওর শ্বাসকষ্টের কারণ নির্ণয়ের বড়ো ইঙ্গিত।'

ডাক্তার বলতে থাকলেন, আসলে আনন্দ ও কষ্টের অনুভূতির অন্তিম উৎস আমাদের মস্তিষ্ক। সেটার কাজকর্মের কথা বৈজ্ঞানিকগণ কিছুটা বোঝেন বটে, তবে অনেকটাই বোঝা বাকি। শ্বাসকষ্টের অনুভূতিতেও মস্তিষ্কের অজানা রহস্য আছে যেটা আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি মাত্র। মানসিক উৎকণ্ঠা আর হতাশার উৎসও তো মস্তিষ্ক।

তৃষার মা বলে উঠলেন, ডাক্তারবাবু কলেজে পড়েছিলাম, মস্তিষ্কের কোনো এক অঞ্চলের সক্রিয়তা যেমন সুখানুভূতি দেয়, তেমনই অন্য কোনো অঞ্চলের সক্রিয়তা আবার কষ্টের অনুভূতি দিয়ে থাকে। ডাক্তার ভালো শ্রোতা পেয়ে সাগ্রহে বললেন, একদম সঠিক। ওইটুকু মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক আর সেই মস্তিষ্কের সামনের দিকের অংশটা, যেটার নাম ফ্রন্টাল লোব, সেখানেই সুখদুঃখ অনুভূত হয়। মস্তিষ্কের একটা কষ্টের অনুভূতির অঞ্চল অন্য কষ্টের অনুভূতির অঞ্চলের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে সহবাস করে। ''বুকের ব্যথা'', ''বুক ধড়ফড়'' বা ''বুক চেপে ধরেছে'' এমন ধারা কষ্টগুলোর অনুভূতি তাই দল বেঁধে আসা-যাওয়া করে। তেমনই হতাশা, উৎকণ্ঠা, মানসিক উদ্বেগের সঙ্গে শ্বাসকষ্টের অনুভূতির নিবিড় যোগাযোগ আছে। মানসিক অতৃপ্তি মস্তিষ্কে শ্বাস গ্রহণের তৃপ্তির অঞ্চলে ব্যাঘাত ঘটালে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এও এক অতৃপ্তির কষ্ট বই তো নয়। সেই কষ্টের অনুভূতি অসুস্থ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, শরীর সম্পর্কে জ্ঞান, প্রকাশের ভাষা ইত্যাদির উপরে নির্ভর করে। যেমন—আমাদের পাকস্থলীতে ঘা বা আলসার হলে আমরা প্রায়শই ভুল করে সেটাকে গ্যাসের ব্যথা বলে অনুভব ও প্রকাশ করি। আসলে সেটা তো আর কোনো গ্যাসের রোগ নয়।

তৃষাকে এবারে ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ওর বাবার ব্যাকুল প্রশ্ন, ওইটুকু মেয়ের আবার এমনকী ক্ষোভ, উৎকণ্ঠা বা হতাশা থাকতে পারে সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ডাক্তার বললেন, এই যে উৎকণ্ঠা বা কোনো কিছু না পাওয়ার বা না অর্জন করতে পারার অতৃপ্তি, এটা প্রত্যেকটি মানুষের চারিত্রিক গঠনের উপরে নির্ভরশীল। আমিও জানি না ওর সমস্যাটা ঠিক কোথায়। তবে মনে হচ্ছে ওর স্কুলের পরিবেশটা নতুন, অপরিচিত। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেবার সমস্যা থাকতেই পারে। এই বয়ঃসন্ধির সময়ে ছেলেমেয়েদের নিজস্ব কিছু শারীরিক ও মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। এই সময়ে কিশোর কিশোরীরা নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে, অন্যের মনোযোগ চায়। সেটা এই সময়ের প্রয়োজনের মধ্যেই পড়ে। পড়াশুনার টার্গেটের সমস্যা, সহপাঠীদের সঙ্গে মানিয়ে নেবার সমস্যা আছে কিনা সেটা আপনাদেরই খুঁজে দেখতে হবে। এটা মনে রাখবেন এই মেনে না নিতে পারার সমস্যা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও দেখা যায়। প্রিয়জন কেউ মারা গেলেও সাময়িক এই ধরনের কষ্ট হতে পারে। আর একটা কাজের কথা বলি, এই কষ্টটা কিন্তু সত্যি কষ্ট, ওর বানানো মনগড়া মিথ্যে বা কষ্টের ভান নয়। ভুলক্রমেও এই কষ্টকে মেকি ভাববেন না। ওর উৎকণ্ঠাটা বাস্তব ব্যাপার, সংবেদনশীল মন নিয়ে সেই উৎকণ্ঠার উৎস অনুসন্ধান করতে হবে, সেটার নিষ্পত্তির চেষ্টা করতে হবে। নিষ্পত্তি না করতে পারার মতো বিষয় হলে, যেমন—স্কুলের পাঠ্যক্রমের বোঝা, ওকে সেই সমস্যাটার মুখোমুখি হবার কাজে সহায়তা করুন।

এবারে তৃষার মায়ের ব্যাকুল প্রশ্ন, ডাক্তারবাবু, এটা যে শারীরিক রোগ নয় সে ব্যাপারে আপনি কেমন করে নিশ্চিত হলেন?

এক ঢোঁক জল খেয়ে ডাক্তার বললেন—কোনো রোগী চেম্বারে ঢোকার সময় থেকে চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। কেমনভাবে একজন রোগী হেঁটে চেম্বারে ঢুকছেন, কথা বলছেন, কথা বলার সময় স্বাভাবিক ছন্দে বলছেন না কথার মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠছেন, মাঝে মাঝে দম নিতে হচ্ছে কিনা এই সব দেখতে দেখতে, একজন চিকিৎসকের বিশ্লেষণ আর নানা কারণের রোগ সম্ভাবনা নির্মূলের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এর পরে রোগের বিবরণ শোনা, প্রশ্ন করে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য জেনে নেওয়ার পরে শারীরিক পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে নির্ণীত রোগের সম্ভাবনা ও নির্মূল করা রোগের না থাকার সম্ভাবনা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চলে। আর এই সবই করে ফেলতে হয় রোগীর সামনে। তৃষার ক্ষেত্রে আমাকে যে সব রোগ নেই বলে নিশ্চিত হতে হয়েছে সেগুলি হল হাঁপানি, হার্ট ফেলিয়োর (পাম্প করার ক্ষমতা কমে যাওয়া), হার্টের ভাল্বের রোগ, হার্টের ছন্দপতনের রোগ (এরিদমিয়া), ফুসফুসে রক্তনালীতে জমাট বাঁধা রক্তের ডেলা আটকে যাওয়ার রোগ (পালমোনারি এম্বোলিজম), থাইরয়েড হরমোন বেশি প্রস্তুত হওয়ার রোগ (হাইপারথাইরইডিজম) . . . এমনকী মৃগী রোগও।

খানিক ভরসা পেয়ে তৃষার বাবা বললেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। আমার একটা শেষ প্রশ্ন আছে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে সবাই তো এরকম কষ্টে ভোগে না। তৃষা কী করে সুস্থ হবে?

ডাক্তার চেয়ারের হেলান দিয়ে বললেন, যেকোনো প্রতিকুল পরিবেশের সংস্পর্শে মানুষের প্রতিক্রিয়া মানসিক গঠন ও সমস্যার মুখোমুখি হবার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপরে নির্ভর করে। মানসিকভাবে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে আর দৈনন্দিনের ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে তৃষার মতো স্পর্শকাতর মানুষ ক্রমে সহনশীল হয়ে যায়। এই সময়ে ওর প্রয়োজন আপনাদের আর চিকিৎসকদের কাছ থেকে ভরসা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোবিদের পেশাদারি পরামর্শ ও কখনো কখনো সামান্য কিছু ওষুধপত্র (Benzodiazepine, Betablocker, Serotonin reuptake inhibitors)। যদিও এটা কী রোগ সেটা বুঝতে না পারার জন্য রোগীরা হৃদ্‌রোগ ও বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রথমে পরামর্শের জন্য এসে থাকেন, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মনোবিদগণ এই রোগের চিকিৎসায় পেশাদারি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন।

* * *

এতক্ষণ আমরা অনেক কিছু আলোচনা করলাম। আমি আর একবার একটা মনে রাখার মতো করে সারাংশ দিচ্ছি। এটা মাথায় রাখলে দুশ্চিন্তা দূর হবে।

সারাংশ

একটা বিষয় লক্ষ করে থাকবেন, দৌড়ানোর সময়ে সুস্থ মানুষ অবলীলাক্রমে ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকেন, এ নিয়ে অভিযোগ করেন না। ওইরকম ঘন ঘন আর গভীরভাবে শ্বাস নেওয়াটা স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার অঙ্গ বলেই এটা সকলে মেনে নেন, ডাক্তারের কাছে ছোটেন না। শারীরিক রোগের কারণে রুগ্ন ব্যক্তিরা পরিশ্রম করার সময়ে ও অন্য কিছু বিশেষ অবস্থায় (যেমন—বেশি ধুলোতে থাকতে হলে) অনেকক্ষণ সময় ধরে ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকেন ও সেই শ্বাসের হাওয়া টানার পরিমাণ বড়ো বড়ো মাপের হয়। হাইপারভেন্টিলেশন-এর ক্ষেত্রে অমনধারা একনাগাড়ে ও বিশেষ

বয়ঃসন্ধির সময়ে ছেলেমেয়েদের নিজস্ব কিছু শারীরিক ও মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। এই সময়ে কিশোর কিশোরীরা নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে, অন্যের মনোযোগ চায়। সেটা এই সময়ের প্রয়োজনের মধ্যেই পড়ে।

কারণের ফলে ঘন ঘন শ্বাস নেওয়ার ঘটনা দেখবেন না। তৃষার মতো রোগীর পক্ষে বেশিক্ষণ এরকম বেশি করে হাওয়া টানা সম্ভবই নয়। এই সমস্যার এইটাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। যেহেতু ওর শারীরিক কারণে বেশি হাওয়া টানার দরকার নেই, ওর শ্বাস নেওয়ার শারীরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ওকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে হাওয়া টানতে বাধা দেবে। বড়োজোর তৃষা ঘন ঘন শ্বাস নেবে, তবে ওর প্রতিটি শ্বাস ক্রমশ অগভীর হয়ে পড়বে। অর্থাৎ ওর শ্বাসকষ্টের সময়ে শ্বাসগুলো ছোটো ছোটো ও অল্প পরিমাণের হতে থাকবে আর সেটা হবে পর্যায়ক্রমে, একনাগাড়ে নয়। ঘন ঘন শ্বাস নেবার ফলে ওর রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা কমে যাবার ফলে ওর মস্তিষ্ক শ্বাস টানায় রাশ টেনে দেবে আর ওর মাথা আর হাত-পায়ে অসাড় বা ঝিনঝিন করার মতো অনুভূতি হবে। তবে ভয় পাবেন না, এমন হলেও এই অনুভূতিগুলো ওর কোনো ক্ষতি করবে না।

তুচ্ছ কারণে শ্বাসকষ্ট (হাইপারভেন্টিলেশন সিন্ড্রোম) একনজরে

১. হঠাৎ করে কোনোরকম আপাত-কারণ ছাড়াই কিছু সময়ের জন্য ঘন ঘন ও ছোটো ছোটো মাপের শ্বাস নেওয়ায় ঘটনা, যার কোনো শারীরিক কারণ বা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

২. এর সঙ্গে রোগীর মাথা ঝিম ঝিম করা, হাত ও পায়ে অসাড় ভাব, বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, হঠাৎ হঠাৎ ঘেমে যাওয়া, ভয়ংকর কিছু ঘটে যাওয়ার ভয় ও চরম উৎকণ্ঠা হতে পারে।

৩. চিকিৎসকের সংশয় দূর করার জন্য অনেক সময়ে হৃদ্‌রোগ ও ফুসফুসের রোগের প্রাসঙ্গিক প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে।

৪. রোগ নিরূপিত হয়ে গেলে রোগী ও তার পরিজনদের রোগ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলা, আশ্বস্ত করা, রোগীর উৎকণ্ঠা ও ভীতির কারণ অনুসন্ধানের পরে তার যথাযথ প্রতিবিধান করা আর রোগীকে সমস্যার মুখোমুখি হতে সাহায্য করা—এগুলোই এই রোগের প্রাথমিক ও সবচেয়ে সফল চিকিৎসা। ক্বচিৎ কদাচিৎ উৎকণ্ঠা ও হতাশা কাটানোর স্বল্পমেয়াদি ওষুধপত্রেরও ব্যবহার এই কষ্টের নিরাময়ে বিশেষ কাজের।

তথ্যসূত্র

১. Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, et al. An official American Thoracic Society statement: update on the mechanisms, assessment, and management of dyspnea. Am J Respir Crit Care Med 2012; 185:435.

২. Scano G, Ambrosino N. Pathophysiology of dyspnea. Lung 2002; 180:131.

৩. Jensen D, Webb KA, Davies GA, O'Donnell DE. Mechanisms of activity-related breathlessness in healthy human pregnancy. Eur J Appl Physiol 2009; 106:253.

৪. Lewis RA, Howell JB. Definition of the hyperventilation syndrome. Bull Eur Physiopathol Respir 1986; 22:201.

৫. Hornsveld HK, Garssen B, Dop MJ, et al. Double-blind placebo-controlled study of the hyperventilation provocation test and the validity of the hyperventilation syndrome, Lancet 1996; 348:154.

৬. Gardner WN. The pathophysiology of hyperventilation disorders. Chest 1996; 109:516.

৭. Bass C. Hyperventilation syndrome: a chimera? J Psychosom Res 1997; 42:421.

৮. Howell JB, Behavioural breathlessness. Thorax 1990; 45:287.

৯. Cowley DS, Roy-Byrne PP. Hyperventilation and panic disorder. Am J Med 1987; 83:929.

১০. Rapee R. Differential response to hyperventilation in panic disorder and generalized anxiety disorders. J Abnorm Psychol 1986; 95:24.

১১. Spinhoven P, Onstein EJ, Sterk PJ, Le Haen-Versteijnen D. Hyperventilation and panic attacks in general hospital patients. Gen Hosp Psychiatry 1993; 15:148.

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, হৃদ্‌রোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

মি টু ড্রাগ

মি টু ড্রাগ (Me too drug)-এর বাংলা কী হবে? আমিও ওষুধ! বহু প্রচলিত, পরিচিত একটা ওষুধের গঠনে সামান্য পরিবর্তন এনে যে বা যেসব ওষুধ তৈরি করা হয়, তাদের বলে মি টু ড্রাগ। এই ওষুধগুলো কতটা দরকারি? লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

আগে পেপটিক আলসারের চিকিৎসা হত অ্যান্টাসিড দিয়ে। আশির দশকে বাজারে এল সিমেটিডিন (cimetidine)। যে গোত্রের ওষুধ তাকে বলা হয় এইচ টু ব্লকার (H_2 blocker)-হিস্টামিন ২ জৈব-গ্রাহকের কাজ আটকে এরা পাকস্থলীর অ্যাসিড উৎপাদনকারী কোষগুলো থেকে অ্যাসিড ক্ষরণ কমায়। সিমেটিডিন খেতে হত দিনে চারবার। একই গোত্রের র‍্যানিটিডিন (ranitidine) বাজারে আসায় চিকিৎসা সহজতর হল, র‍্যানিটিডিন দিনে দু-বার খেলেই চলে। তারপর এল ফ্যামোটিডিন (famotidine), নিজাটিডিন (nizatidine)।

উচ্চ রক্তচাপ কমায়, হার্টের গতিও কমায় বিটা-ব্লকারগুলো (Beta-blockers)। প্রথমে আবিষ্কৃত প্রোপ্রানোলল (propranolol) উচ্চ রক্তচাপ কমাতে গেলে দিনে দু-বার বা তিনবার খেতে হয়। একই গোত্রের অ্যাটেনেলল (atenelol) এল, তা দিনে একবার খেলেই চলে। এখন একই গোত্রের অ্যাসিবুটল (acebutol), বিটাক্সোলল (betaxolol), বিসোপ্রোলল (bisoprolol), এসমোলল (esmolol), মেটোপ্রোলল (metoprolol), নাডোলল (nadolol), নেবিভোলল (nebivolol), পেনবুটোলল (penbutolol), সোটালল (sotalol)। এই গোত্রেরই কার্টিওলল (carteolol), ল্যাবেটালল (labetalol), পিন্ডোলল (pindolol) বাজারে এসেও চলে গেছে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি বা কম কাজের বলে। টিমোলল (timolol) উচ্চ রক্তচাপ কমানোর জন্য আর ব্যবহার করা হয় না, করা হয় গ্লকোমায় চোখের চাপ কমাতে।

উচ্চ রক্তচাপ কমানোর আরেক গোত্রের ওষুধ ক্যালশিয়াম চ্যানেল ব্লকারগুলো (calcium channel blockers)। নিফেডিপিন (nifedipine) প্রথম ক্যালশিয়াম চ্যানেল ব্লকার, খেতে হত দিনে তিনবার। এল অ্যাম্লোডিপিন (amlodipine), যা দিনে একবার খেলেই চলে। তারপর এসেছে অ্যারানিডিপিন (aranidipine), অ্যাজেলনিডিপিন (azelnidipine), বার্নিডিপিন (barnidipine), বেনিডিপিন (benidipine), ক্লিনিডিপিন (clinidipine), ক্লেভোডিপিন (clevodipine), ইসরাডিপিন (isradipine), এফোনিডিপিন (efonidipine), ফেলোডিপিন (felodipine), ল্যাসিডিপিন (lacidipine), লেরকানিডিপিন (lercanidipine), ম্যানিডিপিন (manidipine), নিকার্ডিপিন (nicardipine), নিলভাডিপিন (nilvadipine), নিমোডিপিন (nimodipine), নিসোল্ডিপিন (nisoldipine), নিট্রেন্ডিপিন (nitrendipine), প্রানিডিপিন (pranidipine)।

উচ্চ রক্তচাপ কমানোর আরেক গোত্রের ওষুধ এসিই ইনহিবিটর (ACE inhibitor)—এই গোত্রের প্রথম ওষুধ এনালাপ্রিল (enalapril)। এখন বাজারে আছে আরও বেনাজেপ্রিল (benazepril), ক্যাপ্টোপ্রিল (captopril), ফসিনোপ্রিল (fosinopril), লিসিনোপ্রিল (lisinopril), ময়েক্সিপ্রিল (moexipril), পেরিন্ডোপ্রিল (perindopril), কুইনাপ্রিল (quinapril)।

রক্তে কোলেস্টেরল আর কিছুটা ট্রাইগ্লিসারাইড কমায় স্ট্যাটিনগুলো (statins)। অ্যাটরভাস্ট্যাটিন (atorvastatin) প্রথম ওষুধ, তারপর আসে ফ্লুভাস্ট্যাটিন (fluvastatin), লোভাস্ট্যাটিন (lovastatin), প্রাভাস্ট্যাটিন (pravastatin), রোসুভাস্ট্যাটিন (rosuvastatin), সিমভাস্ট্যাটিন (simvastatin), পিটাভাস্ট্যাটিন (pitavastatin).।

কেন একই গোত্রের এত ওষুধ, যাদের কাজে ফারাক নামমাত্র?

মনে রাখবেন ওষুধ কোম্পানি ওষুধ তৈরি করে মুনাফার জন্য। চাইলেই তো নতুন ওষুধ পাওয়া যায় না। ১০০টা ওষুধ-পদপ্রার্থী রাসায়নিক নিয়ে কাজ করলে তার মধ্যে গড়ে মাত্র ১টা রাসায়নিক ওষুধের সম্মান পায়। নতুন ওষুধকে বাজারে আনতে ওষুধ পিছু খরচ পড়ে গড়ে ৫০০ মিলিয়ন অর্থাৎ ৫০ কোটি মার্কিন ডলার। একটা নতুন ওষুধকে বাজারে আনতে সময় লাগতে পারে ১৫ বছর অবধি, তার মধ্যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য ১০ বছর অবধি।

মনে রাখবেন ওষুধ কোম্পানি ওষুধ তৈরি করে মুনাফার জন্য।

একটা ওষুধ আবিষ্কার হওয়ার পর আবিষ্কারক কোম্পানির পেটেন্ট থাকে একটা নির্দিষ্ট সময় অবধি, সেই সময়ে ওষুধটাকে নিয়ে ইচ্ছেমতো ব্যাবসা করা যায়, ইচ্ছেমতো দাম রাখা যায়। পেটেন্টের সময়সীমা পেরোলে অন্য কোম্পানিগুলোও সেই ওষুধ তৈরি করে বাজারে আনতে পারে। প্রতিযোগিতায় তখন দাম কমে, লাভের হারও কমে। বেশি মুনাফার জন্য ওষুধ কোম্পানির তাই চাই নতুন নতুন ওষুধ।

এবার মনে করুন একটা রাসায়নিক, ওষুধ হিসেবে প্রমাণিত—কার্যকর, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম। আগের উদাহরণগুলোতে যেমন—সিমেটিডিন, প্রোপ্রানোলল, নিফেডিপিন, এনালাপ্রিল, অ্যাটরভাস্ট্যাটিন বা ওমিপ্রাজোল। এদের অণুতে সামান্য পরিবর্তন করলে কার্যকারিতা একই রকম থাকবে, কিন্তু তা হবে নতুন ওষুধ—যাতে বেশি বেশি লাভ করা যাবে বেশ কিছু কাল।

এই নতুন ওষুধগুলোর কিছু অবশ্যই লাভদায়ক। সিমেটিডিন যেখানে দিনে চারবার খেতে হত, সেখানে র‍্যানিটিডিন দু-বার খেলেই চলে, র‍্যানিটিডিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম। প্রোপ্রানোলল বা নিফেডিপিন উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ হিসেবে দিনে তিনবার খেতে হলেও অ্যাটেনেলল আর অ্যাম্লোডিপিন খেতে হয় দিনে একবার।

কোনো এক গোত্রের প্রথম যে ওষুধ আবিষ্কৃত হয়, তাকে বলা যায় ব্রেক-থ্রু ড্রাগ (break through drug) আর ব্রেক-থ্রু ড্রাগের অণুতে সামান্য পরিবর্তন এনে যে নতুন ওষুধগুলো তৈরি করা হয় সেগুলোকে বলা যায় মি টু ড্রাগ।

একটা ওষুধ আবিষ্কার হওয়ার পর আবিষ্কারক কোম্পানির পেটেন্ট থাকে একটা নির্দিষ্ট সময় অবধি, সেই সময়ে ওষুধটাকে নিয়ে ইচ্ছেমতো ব্যাবসা করা যায়, ইচ্ছেমতো দাম রাখা যায়। বেশি মুনাফার জন্য ওষুধ কোম্পানির চাই নতুন নতুন ওষুধ।

ওষুধ কোম্পানি নানান যুক্তিতে মি টু ড্রাগগুলোকে চালায়, ব্রেক থ্রু ড্রাগ-এর চেয়ে কার্যকারিতা বেশি, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম, রোগীর জন্য সুবিধাজনক, যে রোগীদের ক্ষেত্রে প্রথম ওষুধটা কাজ করছে না সে ক্ষেত্রে কাজ করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যে তিনটে উদাহরণ দিলাম—অর্থাৎ সিমেটিডিন থেকে র‍্যানিটিডিন, প্রোপ্রানোলল থেকে অ্যাটেনেলল, নিফেডিপিন থেকে অ্যাম্লোডিপিন—তাছাড়া উদাহরণের বাকি মি টু ড্রাগগুলোর ক্ষেত্রে এসব যুক্তি খাটে না।

অসুবিধা আরও আছে। ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের জন্য কেবল ওষুধের নাম আর মাত্রা জানলেই চলে না, তাছাড়াও জানতে হয়:

- ওষুধটা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়;
- কী কী রূপে পাওয়া যায়;
- কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলবেই না;
- কোন কোন ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে;
- গর্ভাবস্থা বা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মায়েদের দেওয়া যাবে কিনা;
- অন্য ওষুধের সঙ্গে ব্যবহার করলে কোনো অসুবিধা আছে কিনা;
- পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কী কী;
- কীভাবে ওষুধটাকে রাখতে হবে।

ওষুধ কোম্পানি নানান যুক্তিতে মি টু ড্রাগগুলোকে চালায়, ব্রেক থ্রু ড্রাগ-এর চেয়ে কার্যকারিতা বেশি, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম, রোগীর জন্য সুবিধাজনক, যে রোগীদের ক্ষেত্রে প্রথম ওষুধটা কাজ করছে না সে ক্ষেত্রে কাজ করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

২০১৬-র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় আছে ৪০৮টা ওষুধ। ওই বছরেই প্রকাশিত ভারতের অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় আছে ৪০৮ টা ওষুধ। যেকোনো একটা তালিকার সব ওষুধ সম্পর্কেই যদি একজন মানুষকে মনে রাখতে হয় তাহলেই তা কষ্টকর। তার ওপর একই গোত্রের একাধিক, অনেক ক্ষেত্রে বহু ওষুধ সম্পর্কে যদি জানতে হয় তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে ভেবে দেখুন। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, মেহনতি মানুষের জন্য পরিচালিত যুক্তিসঙ্গত বেশ কয়েকটি ক্লিনিকে চিকিৎসক রূপে যুক্ত। ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার আন্দোলনের কর্মী।

Advt.

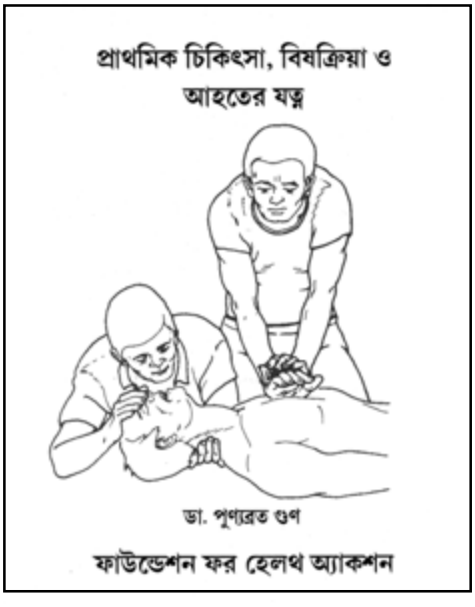

হরেক রকম

টুথপেস্টে নিকোটিন!

একটা সমীক্ষা দেখাচ্ছে, কোলগেট হার্বাল টুথপেস্টে ১৮ মিলিগ্রাম নিকোটিন ও নিম তুলসি টুথপেস্টে ১০ মিলিগ্রাম নিকোটিন আছে। ১৮ মিলিগ্রাম নিকোটিন পেতে গেলে আপনাকে ন-টা সিগারেট খেতে হবে, আর ১০ মিলিগ্রাম নিকোটিন মানে পাঁচটা সিগারেট! অবশ্য টুথপেস্ট প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো এই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

কোলগেট হার্বাল ও নিম তুলসী দুটোই হার্বাল প্রোডাক্ট। অবাক কাণ্ড হল, এ দুটোতে যথাক্রমে ১৮ মিলিগ্রাম ও ১০ মিলিগ্রাম নিকোটিন আছে, যা কিনা ন-টা আর পাঁচটা সিগারেটের নিকোটিনের সমান।

‘দিল্লি ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ’ (DIPSAR)-এর বক্তব্য, অনেক টুথপেস্টে বেশ বেশি নিকোটিন রয়েছে। DIPSAR দিল্লি, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংস্থা, আর দিল্লির সরকারের অর্থে তা চলে। এর বিজ্ঞানী প্রফেসর এস এস আগরওয়াল বলেছেন, ‘আমরা ২৪টি টুথপেস্ট ব্র্যান্ড নিয়ে গবেষণা করেছি। সাতটি ব্র্যান্ড— কলগেট হার্বাল, হিমালয়া, নিম পেস্ট, নিম তুলসী, আরএ থার্মোসিল, সেন্সোফর্ম ও স্টোলিন-এ নিকোটিন পাওয়া গেছে। কোলগেট হার্বাল ও নিম তুলসী দুটোই হার্বাল প্রোডাক্ট। অবাক কাণ্ড হল, এ দুটোতে যথাক্রমে ১৮ মিলিগ্রাম ও ১০ মিলিগ্রাম নিকোটিন আছে, যা কিনা ন-টা আর পাঁচটা সিগারেটের নিকোটিনের সমান।’

তাহলে কি টুথপেস্ট ছেড়ে টুথপাউডার ব্যবহার করবেন? উঁহু! ‘দশটা টুথপাউডার পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ছ-টায় নিকোটিন পাওয়া গেছে—ডাবর রেড, ভিকো, মুসাকা গুল, পায়োকিল, উনাডেন্ট, আর অলকা দন্তমঞ্জন। পায়োকিল-এ নিকোটিন সবচেয়ে বেশি, ১৬ মিলিগ্রাম, মানে আটটা সিগারেটের সমান . . . ভিকো তিন বছর ধরে তামাক [নিকোটিনের উৎস] চালিয়ে যাচ্ছে, আর ডাবর রেড ২০০৮ সালে সেটা বন্ধ করে দিয়ে ফের ২০১১ সালে শুরু করেছে।’ প্রফেসর আগরওয়াল বলেন।

সিগারেট অ্যান্ড আদার প্রোডাক্ট অ্যাক্ট অনুসারে টুথপেস্ট টুথপাউডার ইত্যাদি নন-টোবাকো প্রোডাক্টে আলাদা করে তামাক যোগ করা বেআইনি। এই আইনের ৭ (৫) ধারা মোতাবেক, তামাক আছে এমন সব প্রোডাক্টের প্যাকেটে নিকোটিন ও টার-এর পরিমাণ লিখতে হবে, আর আইন অনুসারে কতটা নিকোটিন ও টার থাকতে পারে তাও লিখতে হবে। প্রফেসর আগরওয়াল জানান, তিনি ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনেরাল অফ ইন্ডিয়া ও দিল্লির ড্রাগ কন্ট্রোলারকে টুথপাউডার ও টুথপেস্ট এরকম তামাক যোগ করার ব্যাপারে লিখেছেন।

DIPSAR যেসব কোম্পানির নাম করেছে, তারা অনেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ভিকো ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর সঞ্জীব পেন্ধকার জানান, DIPSAR-এর রিপোর্ট তাঁদের অজানা নয়, তাছাড়া গোয়ার ড্রাগ কন্ট্রোলার এটা অনুসন্ধান করেছেন, তাঁরা খারাপ কিছু পাননি, আর তাঁদের সংগৃহীত নমুনায় নিকোটিন মেলেনি। হিমালয়া ড্রাগ কোম্পানিও অনুরূপ বক্তব্য রেখেছে। আর ডাবর ইন্ডিয়ার মুখপাত্র জানান, DIPSAR-এর পদ্ধতি না দেখে তাঁরা মন্তব্য করবেন না। প্রফেসর আগরওয়াল বলেন, এরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা করছে, আর তিনি তাঁর পরীক্ষাপদ্ধতি জানাতে সবসময় প্রস্তুত।

সিগারেট ও পানমশলায় নিকোটিন থাকলে যতটা ক্ষতি, টুথপেস্টে থাকলে ক্ষতি তার চাইলে কম নয়। নিকোটিন থাকলে সেই টুথপেস্টে নেশা হয়ে যায়, যেমন বিড়ি, সিগারেটে হয়। এটা দাঁতের ক্ষতি করে, বিশেষত দাঁতের এনামেলের। নিকোটিন জিভ ও মুখে শোষিত হয়। তার ফলে মুখবিবরের ক্যান্সার হয়, আর ক্যান্সার সৃষ্টিকারী দ্রব্যটি গ্রাসনালী, পাকস্থলী ও অন্যত্র যায়। এছাড়া পেশি ও মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয়।

সিগারেট ও পানমশলায় নিকোটিন থাকলে যতটা ক্ষতি, টুথপেস্টে থাকলে ক্ষতি তার চাইলে কম নয়। নিকোটিন থাকলে সেই টুথপেস্টে নেশা হয়ে যায়, যেমন বিড়ি, সিগারেটে হয়। এটা দাঁতের ক্ষতি করে, বিশেষত দাঁতের এনামেলের।

তথ্যসূত্র: Toothpastes contain cancer causing nicotine, finds study. *India Today*, New Delhi, September 1, 2011, ইন্টারনেটে প্রাপ্য http://indiatoday.intoday.in/story/toothpastes-contain-cancer-causing-nicotine-study/1/150836.html

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

টুকরো খবর

ডাক্তারির ধকল সামলাতে না পেরে ভারতীয় ডাক্তাররা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছেন

ডাক্তারি এ দেশে এক মর্যাদাপূর্ণ পেশা। এদেশের রোগীদের কাছে তাঁরা প্রায় 'ভগবান'। কিন্তু তাঁদের নিজেদের কী হাল? শহরের এক মেডিক্যাল কলেজের গবেষণায় জানা গেছে: পশ্চিমী ডাক্তারদের মতোই ভারতীয় ডাক্তাররাও চাপ সইতে না পেরে 'বার্ন আউট' (নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া) রোগে ভুগছেন। রোগের লক্ষণগুলো: আবেগ-অনুভূতিহীন হয়ে যাওয়া, অসন্তোষ বেড়ে যাওয়া।

২৫-দফা প্রশ্ন নিয়ে প্রায় ৫০০ ডাক্তারের থেকে যে সাড়া পাওয়া গেছে, দেখা গেছে সাধারণভাবে ডাক্তারদের বিকাশের অভাব ('আমার কাজের ধারাই এমন যে এর মধ্যে নিজের সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোলার কোনো সুযোগই নেই'); অতিরিক্ত কাজের বোঝা ('পেশার কাজের চাপে আমার নিজের দরকারি কাজগুলো করে উঠতে পারি না।') অথবা অবহেলা ('যখন দেখি কাজের জায়গায় চিকিৎসার ধারা আমার মন মতো হচ্ছে না তখন হাল ছেড়ে দিই।')

গবেষণাপত্রের লেখক ডা. প্রণব মোদী ও ডা. অমিত ঘড়পুড়ে বলেছেন: 'প্রায় ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা নিঃশেষিত-ভাবাবেগ রোগের এবং ৬৬ শতাংশ নৈর্ব্যক্তিকতা (রোগীদের প্রতি সহমর্মিতার অভাব) রোগের শিকার।'

আমার কিছু সহকর্মীকে একটানা চৌত্রিশ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। তাই যখন শোনা যায় ডাক্তাররা রোগীদের সঙ্গে তেড়েমেড়ে কথা বলছেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা এতটা ধকল নেওয়া কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই সম্ভব না।

এদেশে সেরা ছাত্র-ছাত্রীরাই ডাক্তারি পড়তে যায়। কিন্তু *Cureus* নামে একটি মেডিক্যাল জার্নালে দেখানো হয়েছে ব্যক্তিগত সাফল্যের নিরিখে প্রায় ৮৭ শতাংশ ডাক্তার খুবই নীচের দিকে আর ৬৩ শতাংশ বলেছেন তাঁরা তাঁদের পেশাগত কাজে মোটামুটিভাবে খুশি।

ডাক্তারদের 'বার্ন আউট' হয়ে যাওয়া নিয়ে পশ্চিমে অনেক কাজ হয়েছে কিন্তু এদেশে খুবই কম। ২০১২-য় ৭২৮৮ জন চিকিৎসককে নিয়ে এক গবেষণায় দেখা গেছে ৪৫.৮ শতাংশ কোনো-না-কোনো 'বার্ন আউট' লক্ষণে ভুগছে। 'দেশের সাধারণ মানুষের তুলনায় ডাক্তারদের মধ্যে 'বার্ন আউট'-এর মাত্রা ১০ শতাংশ আর অসন্তোষের মাত্রা ১৭ শতাংশ বেশি'—বলেছেন ডা. মোদী।

ডাক্তারদের 'বার্ন আউট' হওয়া একটা সামাজিক সমস্যা কেননা সরাসরি এর প্রভাব পরে রোগী এবং স্বাস্থ্যসুরক্ষার উপর। লিভার-সার্জন ডা. সঞ্জয় নাগরাল, যিনি আবার *Indian Journal of Medical Ethics*-এর সম্পাদক, বলেছেন: 'অন্যান্য পেশায় 'বার্ন আউট'-এর মাত্রা যেমন বেশ চড়া, ডাক্তারদেরও সম্ভবত তাই। কিন্তু উদ্‌বেগের কারণ হল 'বার্ন আউট' ডাক্তারদের রোগীদের প্রতি সহমর্মিতার অভাব দেখা যায় কিংবা তাঁরা চিকিৎসায় ভুলভ্রান্তি করে ফেলতে পারেন।'

ডা. অমিত ঘড়পুড়ে বলেছেন: 'আমার কিছু সহকর্মীকে একটানা চৌত্রিশ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। তাই যখন শোনা যায় ডাক্তাররা রোগীদের সঙ্গে তেড়েমেড়ে কথা বলছেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা এতটা ধকল নেওয়া কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই সম্ভব না।'

নতুন গবেষণায় দেখা গেছে নারী ও প্রবীণ ডাক্তারদেরই অবস্থা সবথেকে খারাপ। 'ফরাসি ইন্টেন্সিভিস্ট-এর মধ্যে দেখা গেছে পুরুষের তুলনায় মহিলা ডাক্তারদের মধ্যে ''বার্ন আউট''-এর মাত্রা অনেক বেশি। এখানেও মহিলা ডাক্তারদের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটছে,'—একথা বলেন ডা. মোদী। তিনি আরও বলেন, সম্ভবত নারীদের থেকে বাড়িতে এবং কাজের জায়গায় 'প্রত্যাশা অনেক বেশি থাকায়' তাঁদের চাপ সামলাতে হয় অনেক বেশি। ডা. দীপক ল্যাংডে এই গবেষণার অন্যতম উপদেষ্টা, বলেন: 'বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ ডাক্তারদের ওপর চাপ পড়ে অনেক বেশি, ফলে তাঁরা জীবন ও পেশার ভারসাম্য হারিয়ে অনেক বেশি মাত্রায় ''বার্ন আউট'' হয়ে যান।'

আরও একটা কথা: 'বার্ন আউট'-এর মাত্রা এমবিবিএস-দের থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটদের বেশি। 'এ থেকে বোঝা যায় ''বার্ন আউট'' বিশেষ প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। এটাই স্বাভাবিক কেননা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। ফলে তাঁদের অনেক বেশি ঘণ্টা খাটতে হয় এবং কাজের ধরনও তাঁদের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে।'—ডাক্তার বলেন।

ডা. প্রণব মোদী বলেন: 'বিপুল রোগীর চাপ অল্প সংখ্যক ডাক্তারকে সামলাতে হয় ফলে তাঁদের দীর্ঘ কাজের সময় ব্যয় করতে হয়। ফলে পরিবার বা বিনোদনের জন্যে একটুও সময় পান না।' এসব কারণেই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে 'বার্ন আউট'-এর মাত্রা বেশি।

তথ্যসূত্র: *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, ১০ জানুয়ারি ২০১৭। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

টুকরো খবর

সুখী হতে চান? আপনার মোবাইলে ই-মেল অ্যাপ উড়িয়ে দিন

২০০০ মানুষকে নিয়ে করা এক সমীক্ষা বলছে, যাঁরা তাঁদের যন্ত্রে (মোবাইল বা কম্পিউটার) ই-মেল আসা-মাত্র সেটা দেখেন, তাঁরা উচ্চ ই-মেল চাপের শিকার। ভোরবেলা বা বেশি রাতে ই-মেল দেখেন যাঁরা তাঁরাও উচ্চ ই-মেল চাপের শিকার। আর যাঁরা উচ্চ ই-মেল চাপের শিকার,

ই-মেল হল দু-মুখী তরোয়াল। যোগাযোগের জন্য এর দাম অপরিসীম। কিন্তু এটার জন্য আমাদের অনেকের মানসিক চাপ বা স্ট্রেস ও হতাশা বাড়ে।

তাঁরা বাড়ি আর অফিস ও অফিস আর বাড়ি—কাজের ব্যাপারে এই উভমুখী চাপের শিকারও হয়ে পড়েন। কিন্তু কাজের প্রকৃত চাপের চাইতে ব্যক্তিত্বের ধরন মানসিক চাপের জন্য বেশি দায়ী হতে পারে।

ম্যানেজারের পদে আসীন মানুষেরা ই-মেল চাপ বেশি অনুভব করেন। আমাদের অভ্যাস, স্বভাব, ই-মেল বার্তার বিষয়ে আমাদের ইমোশনাল রি-অ্যাকশন, ই-মেল এটিকেট, সব মিলিয়ে স্ট্রেস বাড়ে।

'ই-মেল হল দু-মুখী তরোয়াল। যোগাযোগের জন্য এর দাম অপরিসীম। কিন্তু এটার জন্য আমাদের অনেকের মানসিক চাপ বা স্ট্রেস ও হতাশা বাড়ে।'

লন্ডনের ফিউচার ওয়ার্ক সেন্টার-এর রিচার্ড ম্যাককিসন একথা বলেন। তিনিই ২০০০ মানুষকে নিয়ে করা ওই সমীক্ষা-রিপোর্টের এক লেখক।

মাত্রাছাড়া চাপ হলে তার থেকে ছুটি নিতেই হবে। আসার সঙ্গে সঙ্গে ই-মেল দেখা বন্ধ করতে হবে, ই-মেল নোটিফিকেশন বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে রাত্রে, আর পরিবারের সঙ্গে থাকার মুহূর্তগুলোতেও।

তথ্যসূত্র: Turn off your e-mail app on phone to be happier. *Times of India*. Jan 5, 2016 ইন্টারনেটে http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/de-stress/Turn-off-your-e-mail-app-on-phone-to-be-happier/articleshow/50437488.cms. প্রাপ্ত। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডেঙ্গু আটকাতে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড মশা?

জিএম শস্য ও জিএম ব্যাকটিরিয়া নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই, আর সে-দুশ্চিন্তার কারণও আছে। নানা দৈত্যাকার কর্পোরেট জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বা 'জিএম' শস্য ও ব্যাকটিরিয়া নিয়ে যে ব্যাবসা করছে তা প্রায়শই সাধারণ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কিন্তু 'জিএম' প্রযুক্তিকে খারাপ বলে ফেলে দেওয়া যায় না। যেমন সম্প্রতি ডেঙ্গুর বাহক ইডিস মশাকে জেনেটিক্যালি বদলে দিয়ে, অর্থাৎ 'জিএম' প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে অন্যরকম মশা তৈরি করা গেছে। প্রতি বছর ডেঙ্গুর সংক্রমণে ভোগে প্রায় চার কোটি মানুষ, আর মৃতের সংখ্যাও অগ্রাহ্য করার মতো নয়, এ নিয়ে কোনো কার্যকর উপায় এখনও বেরোয়নি। সুতরাং জিএম মশা দিয়ে কিছু কাজ হলেও খুব ভালো হয়।

যখন কোনো ইডিস মশা ডেঙ্গুরোগ আক্রান্ত কাউকে কামড়ায় তখন ডেঙ্গু ভাইরাস মশার শরীরে ঢোকে, আর মশার অন্ত্রে বৃদ্ধিলাভ করে। মশার শরীরে এই ভাইরাস মারার একটা প্রচেষ্টা চলে। জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির গবেষকরা যে জিএম মশা তৈরি করেছেন সেটির শরীরে ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিরোধ ব্যবস্থাটি একটু জোরদার, ফলে ভাইরাস সংখ্যায় কম বাড়ে। আর তার ফলে সেই মশা কাউকে কামড়ালে তার ডেঙ্গু হবার সম্ভাবনা কমে। দুঃখের বিষয় হল, জিকা ভাইরাস বা চিকেনগুনিয়া ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই জিএম মশার প্রতিরোধ ব্যবস্থা কিছুমাত্র জোরদার নয়, ফলে এই পরিবর্তিত মশাও এইসব রোগে আটকাতে কাজে আসবে না। তাই বহু-ভাইরাস প্রতিরোধী জিএম মশা তৈরি করার চেষ্টা চলছে। সেটা সফল হলে আশা করা যায় জিএম মশা দিয়ে সাধারণ মশককুলকে আস্তে আস্তে প্রাকৃতিক উপায়েই হটিয়ে দেওয়া যাবে। তখন কামড় থাকবে কিন্তু বিপদ থাকবে না।

তথ্যসূত্র: Genetically modified mosquitoes may help fight against dengue virus. PTI। Washington। Updated: January 19, 2017 http://indianexpress.com/article/technology/science/genetically-modified-mosquitoes-may-help-fight-against-dengue-virus-4482253/ তে প্রাপ্ত। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

টুকরো খবর

গর্ভপাত সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন

এই জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট গর্ভপাত নিয়ে যে রায় দিয়েছেন তাতে ১৯৭১ সালের গর্ভপাত সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধনী আনার প্রচেষ্টা জোর পেল। উচ্চতম এই আদালত মুম্বাইয়ের এক মহিলার ২৪ সপ্তাহে গর্ভপাত করবার অনুমোদন দিয়েছেন। এমনিতে গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলে গর্ভপাতের আইনি অনুমোদন মেলে না। কিন্তু এ

গর্ভস্থ ভ্রূণের খুব বড়ো ধরনের অস্বাভাবিকতা আছে, সে জন্মালেও বাঁচবে না। ভ্রূণটির মাথার খুলি তৈরি হয়নি, তাই সে জন্মের সময় মায়ের প্রাণসংশয় হতে পারত।

ক্ষেত্রে ডাক্তাররা বুঝেছিলেন, গর্ভস্থ ভ্রূণের খুব বড়ো ধরনের অস্বাভাবিকতা আছে, সে জন্মালেও বাঁচবে না। ভ্রূণটির মাথার খুলি তৈরি হয়নি, তাই সে জন্মের সময় মায়ের প্রাণসংশয় হতে পারত।

এই বিষয়ে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রক এর আগেই আইন সংশোধন করার কথা বলেছে, কিন্তু এখনও সংসদে সেই আইন পাশ হয়নি। আইনের পরিবর্তন ঘটে গেলে এরকম ক্ষেত্রে মহিলাকে আর কোর্টে দৌড়ে সময় নষ্ট, বিশাল পয়সা নষ্ট ও মানসিক আঘাত সহ্য করার দরকার হত না। আসলে ১৯৭১ সালের গর্ভপাত সংক্রান্ত আইন (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) বর্তমান যুগের পক্ষে অনেকটাই প্রাচীন। যে সংশোধনীটি এখনই দরকার তা হল এই যে, গর্ভস্থ ভ্রূণের পক্ষে জন্ম নেবার পরে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয় এমন বড়ো ধরনের অস্বাভাবিকতা থাকলে সেই গর্ভপাত সবসময়েই করতে দেওয়া উচিত। বর্তমান আইনে গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলে গর্ভপাত বেআইনি। কিন্তু এই আইন যখন প্রণীত হয় তখন ডাক্তারি প্রযুক্তির এত উন্নতি হয়নি, আগে থেকে গর্ভস্থ ভ্রূণের নানা অস্বাভাবিকত্ব জোর দিয়ে বলা যেত না। অপরদিকে, ২০ সপ্তাহ সময়সীমার মধ্যে অনেক গুরুতর অস্বাভাবিকত্ব এখনও ধরা সম্ভব নয়। তাই এই সংশোধনীতে সময়সীমা সবার ক্ষেত্রেই বাড়িয়ে ২৪ সপ্তাহ করার কথা বলা হয়েছে।

আইনি সংশোধনীটি এখন মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্মতি পেলে সংসদে পেশ হবে।

তথ্যসূত্র: CHANGES ON CARDS? SC's abortion ruling brings focus back on proposed amendments to MTP Act. *The Times of India (Delhi)*. Jan 17 2017 ইন্টারনেটে প্রাপ্য: http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31808&articlexml=CHANGES-ON-CARDS-SCs-abortion-ruling-brings-focus-17012017013062। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

প্রথম স্থিতিশীল অর্ধ-কৃত্রিম জীবন

আমেরিকার 'দ্য স্ক্রিপস রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (TSRI)-এর বিজ্ঞানীরা বিশ্বের প্রথম স্থিতিশীল অর্ধ কৃত্রিম জীবন তৈরি করেছেন। সেই অর্ধ-কৃত্রিম জীব বা stable semi-synthetic organism-টি হল এক ব্যাকটিরিয়া।

জীবনের মূল ইনফর্মেশন বহন করে ডিএনএ, আর তাতে আছে চারটে 'বেস'। তাদের মধ্যে দুটো বেস বন্ধন তৈরি করে 'বেস পেয়ার' (base pair) বা 'যুগ্ম-বেস' সৃষ্টি করে, আর সেই 'যুগ্ম-বেস' ডিএনএ-র বিখ্যাত 'ডাবল হেলিক্স'-এর ধাপগুলো তৈরি করে। চারটের মধ্যে কোন দুটো বেস আছে তার ওপর ডিএনএ-র 'কোড' বা সংকেত নির্ভর করে। আর ব্যাকটিরিয়া থেকে মানুষ, সকলের জন্যই এই কোড একই।

এর আগেই ই. কোলাই নামক ব্যাকটিরিয়ার ডিএনএ-তে কৃত্রিমভাবে তৈরি বেস পেয়ার ঢোকানো হয়েছিল। কিন্তু কোষ বিভাজনের সময় কয়েক প্রজন্ম পরে সেই কৃত্রিম বেস পেয়ার-কে ই. কোলাই খারিজ করে দিয়েছিল। এবারের কাজে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে এককোষী প্রাণী ডিএনএ-র মধ্যে নতুন কৃত্রিম উপায়জাত বেস পেয়ার-কে ধরে রাখতে পারে।

প্রাকৃতিক বেসগুলোর সংক্ষিপ্ত হল A, T, C ও G। তার সঙ্গে যে দুটো কৃত্রিম বেস আমেরিকার বিজ্ঞানীরা যোগ করেছেন তাদের নাম দিয়েছেন X ও Y। ব্যাকটিরিয়া যাতে কৃত্রিম বেস পেয়ার-কে তার ডিএনএ-তে ধরে রাখে সেজন্য এবারে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এবং নতুন পদ্ধতিতে দেখা গেছে এই কৃত্রিম বেস X ও Y-কে ব্যাকটিরিয়াটি কোষ-বিভাজনের সময় ধরে রাখছে। অর্থাৎ কৃত্রিম হলে কী হবে, সেটা ব্যাকটিরিয়ার কাছে আসল বেস পেয়ার বলেই প্রতিভাত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: World's first stable semi-synthetic organism, a bacterium, created. *The Times of India (Delhi)*, Jan 25 1017, ইন্টারনেটে http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31808&articlexml=Worlds-first-stable-semi-synthetic-organism-a-bacterium-25012017023020-তে প্রাপ্ত। স্বাস্থ্যের বৃত্তে